

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নাস্তিক্যবাদ অবিশ্বাস নিরসন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছূছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Shermin Akter Jhuma

রোলঃ 21500416

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নাস্তিক্যবাদ অবিশ্বাস নিরসন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

নাস্তিক্যবাদ অবিশ্বাস নিরসন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Shermin Akter Jhuma

রোলঃ 21500416

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “নাস্তিক্যবাদ অবিশ্বাস নিরসন” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Shermin Akter Jhuma, আইডিঃ 21500416 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “নাস্তিক্যবাদ অবিশ্বাস নিরসন” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছূছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

Shermin Akter Jhuma

তারিখঃ

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

আইডিঃ 21500416

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
লেখকের কথন	৭
ভূমিকা	৮
প্রথম অধ্যায়	
নাস্তিক্যবাদ কি?	১১
নাস্তিক্যবাদের প্রতীক	১১
ব্যুৎপত্তি	১২
নাস্তিক্যবাদের প্রসার	১৩
নব-নাস্তিক্যবাদ	১৪
পরিসংখ্যান	১৬
ইউরোপ মহাদেশ	১৭
এশিয়া মহাদেশ	১৭
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৭
আমেরিকা মহাদেশ	১৯
ধর্মহীন	২০
আরব বিশ্ব	২০
সম্পদ এবং শিক্ষা	২১
নাস্তিকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী	২২
ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী দেশসমূহ	২৩
প্রত্যক্ষ বনাম পরোক্ষ	২৩
কতজন মানুষ নাস্তিক?	২৫
নাস্তিকতা কোথায় রয়েছে?	২৫
নাস্তিকতার মূল বিশ্বাসগুলি কি কি?	২৭
বিভিন্ন ধরনের অবিশ্বাস	২৮
নাস্তিকতা অনুশীলনে কিছু প্রধান ছুটির দিন কি কি?	২৯

বিতর্কের উৎস	৩০
সহজাত বিশ্বাসের প্রমাণ	৩১
ফিলোসফির দৃষ্টিতে সহজাত বিশ্বাস	৩৪
এভিডেন্স ট্রুথ বা ফাস্ট প্রিন্সিপাল কি ?	৩৪
ইসলামের দৃষ্টিতে সহজাত বিশ্বাস	৩৫
নাস্তিকতা কি স্বভাবজাত?	৩৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সাধারণ প্রশ্ন উত্তর	৩৭
১. সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে ?	৩৭
২. আল্লাহ কেনো কোনো মহিলা নবী প্রেরণ করেনি?	৪১
৩. ইসলামে নিজের ইচ্ছে বলতে কিছুই নেই?	৪২
৪. মুসলিম কি প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করে?	৪৪
৫. সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছেন ও পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন?	৪৬
৬. কেনো কাফেরদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়?	৪৮
৭. আল্লাহকে প্রশংসা করা কি প্রয়োজন?	৪৯
৮. ইসলাম কি বহু খোদায় বিশ্বাস করে ?	৫১
৯. ইসলাম কেন মুসলিমদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?	৫১
১০. কুরআন কে কিভাবে আল্লাহর আয়াত বলা যায়?	৫৩
১১. ইসলামে বহু-বিবাহ অনুমোদিত কেন?	৫৫
১২. সকল ধর্ম একই?	৬০
১৩. কেন আল্লাহ খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং ইহুদি বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠান?	৬৫
১৪. ইসলাম একটি বর্বর ধর্ম?	৬৭
১৫. সালমান রুশদি অথবা তাসলিমা নাসরিনের মৃত্যুদন্ড জারি করা হয়েছে কেন?	৬৯
১৬. মুসলিমগণ 'GOD' কে আল্লাহ বলেন না কেনো?	৭১
১৭. ইসলাম নারীদেরকে কেন অবমূল্যায়ন করেছে?	৭২

১৮.মুসলিমরা কেন এতো পশু হত্যা করে?	৭৯
১৯. শুকর মাংস নিষিদ্ধ কেন?	৮৫
২০. ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ কেন?	৮৮
তৃতীয় অধ্যায়	
দাওয়াহ দেওয়ার পদ্ধতি	৯৪
১. কনভারসেশন ১	৯১
২. কনভারসেশন ২	৯৫
৩. কনভারসেশন ৩	৯৭
৪. কনভারসেশন ৪	৯৮
৫. কনভারসেশন ৫	১০১
৬. কনভারসেশন ৬	১০৩
৭. কনভারসেশন ৭	১০৪
৮. কনভারসেশন ৮	১০৬
৯. কনভারসেশন ৯	১০৮
১০. কনভারসেশন ১০	১১০
চতুর্থ অধ্যায়	
আমরা এই নাস্তিকদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করব ?	১১৬
উপসংহার	১১৯

লেখকের কথন

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর তা'আলার যিনি আমাকে নাস্তিক্যবাদ টপিক নিয়ে কাজ করার এবং আনজাম দেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আমি অধমের কোনো যোগ্যতা নেই। আমার কাজের প্রতিটি অক্ষর কেবল দাওয়াহর উদ্দেশ্যে।

পঠিত প্রত্যেক পাঠকের কাজে দুয়ার আর্জি রব্ব যেহা আমাৰ এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করে নেন এবং প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে যেহা ইখলাস অবলম্বন করার তাওফীক দিন। ভবিষ্যতে ও যেহা উত্তম দাঈ হিসেবে দ্বীনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি। দ্বীনের বিজয় যেহা আমাকে নিয়েই হয়।

পরিশেষে আর্জি এই এসাইনেন্ট এর যাবতীয় ভুল ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার ইসলামের জন্যে দোয়া করবেন।

ভূমিকা

নাস্তিকতা কী? নাস্তিকতা হচ্ছে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, প্রজ্ঞাময়, পরাক্রমশালী, আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্ব অবিশ্বাস করার শয়তানী মতবাদ। নাস্তিক্যবাদিরা আল্লাহ তা‘আলার অসীম ক্ষমতা, অপার কুদরত, সুবিশাল মালিকানা ও যাবতীয় গুণাবলী অস্বীকার করে। জান্নাত, জাহান্নাম, পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবনকে অসম্ভব জ্ঞান করে। তাদের ধারণা, এ মহাবিশ্ব প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এর কোনো ব্যবস্থাপক নেই। নাস্তিকদের মতবাদ হল, Nature nevar breaks her own law অর্থাৎ ‘প্রকৃতি কখনো তার স্বভাব ভঙ্গ করে না।’ একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সামনে রেখে তাদের জীবন পরিচালিত করে। এটা যে সর্বৈব মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয় তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

বস্তুতঃ নাস্তিকরা সত্যের অপলাপকারী, সত্যে অবিশ্বাসী। তারা শুধু বস্তুবাদে বিশ্বাসী। বস্তুবাদের রূপই হল নাস্তিকতা। এই মতবাদের জনক হচ্ছে ডারইউন, হিউম, হেগেল, এঞ্জেলস, মার্ক্স প্রমুখ।

একজন স্রষ্টার প্রতীতি সমগ্র মানুষের রক্ত-কণায় মিশে আছে। এছাড়া সে নিজের মধ্যে বিরাট শূন্যতা অনুভব করে; শান্তির ঠিকানা খোঁজে পায় না। এটা তার চিরন্তন উদ্দীপনা। ‘স্রষ্টার পরিচয় লাভ’ সে উদ্দীপনারই বাস্তব ঠিকানা। কিন্তু যারা স্রষ্টার পরিচয় লাভে ব্যর্থ হন, তারা অন্য কোনো কৃত্রিম জিনিসকে উপাস্যের আসনে বসান। একজন নেতা যখন কোনো মহান ব্যক্তিত্বের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়ান, তখন তিনি সে কাজেরই পুনরাবৃত্তি করেন, যা একজন ধার্মিক নিজের মাবুদের জন্য রুকু ও সেজদার মাধ্যমে করে থাকেন। একজন কম্যুনিস্ট যখন কালমার্ক্স বা লেনিনের প্রতিমূর্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় চলার গতি কমিয়ে মাথা নত করে চলেন, তখন তিনিও নিজের ‘উপাস্য’ সমীপে আপন ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কিন্তু নিজের বাবাকে ছেড়ে সন্তান যখন অন্যকে বাবা বলে ডাকে, বাবা তখন বড় রুষ্ট হন। এ রুষ্ট আচরণনীতি একজন নগণ্য মানুষের বেলায় যথার্থ হলে পরাক্রমশালী স্রষ্টার বেলায় কেন তা সঙ্গত হবে না! প্রকৃতি ও বিজ্ঞানে স্রষ্টার অস্তিত্বের ওপর অজস্র প্রমাণ

বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে অস্বীকার করে চলছি। তদস্থলে কৃত্রিম জিনিস এমনকি স্বয়ং বিজ্ঞানকে উপাস্যের আসন দিচ্ছি। ‘Nature nevar breaks her own law’ তথা ‘প্রকৃতি ও বিজ্ঞান আল্লাহর অস্তিত্বের ঘোষণা করেছে’- এটি একটি পরাবাস্তব কথা। ‘আল্লাহ আছেন’ এই চরম সিদ্ধান্তটি যেমন অস্বীকার করার উপায় নেই, তেমনি ‘আল্লাহ নেই’ এই প্রকল্পটিও প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহকে অস্বীকার করা যেতে পারে, যেমন অস্বীকার করেছেন- লামর্ক, ওয়ালেস, ডারউইন, কালমার্ক্স, লেনিন- কিন্তু নাস্তিকেরা তাদের অস্বীকারের পক্ষে যুক্তিধর্মী কোনো কিছু কোনোদিন প্রকাশ করতে পারেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে যাদের বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞান সীমিত ছিলো, তারাই কেবল স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে। গভীর জ্ঞানের দার্শনিকরা কখনো স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে পারেননি। ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, ‘সামান্য দর্শনজ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর সুগভীর দর্শনজ্ঞান তাকে ধর্মের দিকে টানে।’

অবশেষে বেদনাক্ত হৃদয়ে বলবো, এ পার্থিব জগতকে বেতালভাবে ভোগ করার বাসনা বিলাস থেকে স্রষ্টাকে অস্বীকারের প্রবণতা আজ বড় বেড়ে গেছে। কিন্তু অবিশ্বাসী নাস্তিকদের জেনে রাখা উচিত, এ জীবনের উচ্ছ্বাসিত কল্লোল একদিন থেমে যাবে। তখন অন্তিম মুহূর্তে ফ্যারাডের মত স্রষ্টাকে স্বীকার করার সুযোগ হয়ত নাও হতে পারে।

সত্য কথা হলো আল্লাহকে কেউ যদি জোর করে অস্বীকার না করে, খোলা মন নিয়ে যদি বিশ্বচরাচরে দৃষ্টিপাত করে তাহলে তার কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না। আল্লাহ যেমন বলেছেন,

عَمَّا أَلْعَزَّشَ رَبِّ اللَّهِ فَسُبْحَنَ لَفَسَدَتَاُ اللَّهُ إِلَّا هُ الْهَةِ فِيهِمَا كَانَ َلُو ﴿
[٢٢: الانبياء] ﴿ ٢٢ يَصِفُونَ

‘যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অল্লীলতাসর্বস্ব সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা যতই সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি,

উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হচ্ছি; সমাজ-সংসারের কর্তাবাবুগণ ততই উদাসীনচিন্তে সবকিছু এড়িয়ে চলছেন এবং অকপটে হজম করে নিচ্ছেন। নারী নিয়ে সবচেয়ে বড় হোলি খেলা দেখালো নাস্তিক্যবাদের দোসররা। নারীদেরকে কীভাবে প্রকাশ্য রাজপথে জনসাধারণের খাদ্যে পরিণত করতে হয় তাও দেখিয়ে গেল ওরা কর্তাবাবুগণের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে। এতদিন মানুষ নাস্তিক্যবাদকে কেবলই স্রষ্টাদ্রোহী বলে জেনে এসেছে। কিন্তু ওরা যে নগ্নদস্যু ও চরিত্রবিধ্বংসী অভিসারীদল, সেটা ঘটা করে প্রকাশ পেলো সাম্প্রতিক সময়ের ওদের কর্মকাণ্ডে। তাই নাস্তিক্যবাদ কেবল আল্লাহর দুশমনই নয়, নারী ও সতীত্বেরও দুশমন। সমাজ ব্যবস্থা ও শান্তি-সম্প্রীতির জন্য এরা মারাত্মক বাধা। এই বাধার শিকড় না কাটলে নারীদের জন্য তাদের সতীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হবে। হায় যদি আমাদের ছেলে-মেয়েরা প্রকৃত শত্রু-মিত্র চিনতে পারত! আল্লাহর বাণীর অর্থ যদি বুঝত! আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة : ٢٢١]

‘আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।’ (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ২২১)^১

সূত্র <https://www.hadithbd.com/books/link>

^১ সূত্র <https://www.hadithbd.com/books/link>

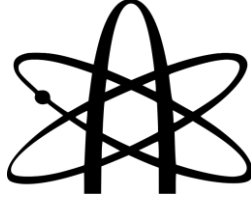
প্রথম অধ্যায়

নাস্তিক্যবাদ কি?

নাস্তিক্যবাদ (অন্যান্য নাম: নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিকতাবাদ) (ইংরেজি: Atheism) একটি দর্শনের নাম যাতে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না এবং সম্পূর্ণ ভৌত এবং প্রাকৃতিক উপায়ে প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়। মূলত আন্তিক্যবাদ এর বর্জনকেই নাস্তিক্যবাদ বলা যায়।^[2]

নাস্তিক্যবাদ বিশ্বাস নয় বরং অবিশ্বাস এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাসকে খণ্ডন নয় বরং বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই এখানে মুখ্য। শব্দটি সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা ঈশ্বরের স্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতি বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলে তারা স্বীকার করে।^[3]

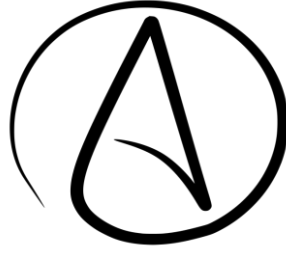
নাস্তিক্যবাদের প্রতীক



পারমাণবিক ঘূর্ণি , আমেরিকান এথিয়েস্টস কর্তৃক অনুমোদিত নাস্তিক্যবাদের প্রতীক।

² Nielsen, Kai (২০০৯)। "Atheism"। Encyclopædia Britannica। সংগ্রহের তারিখ ২০০৯-০৮-২৩। Atheism, in general, the critique and denial of metaphysical beliefs in God or spiritual beings.... Instead of saying that an atheist is someone who believes that it is false or probably false that there is a God, a more adequate characterization of atheism consists in the more complex claim that to be an atheist is to be someone who rejects belief in God for the following reasons (which reason is stressed depends on how God is being conceived)...

³ religioustolerance.org's short article on Definitions of the term "Atheism" www.religioustolerance.org গুয়েব্যাংক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে suggests that there is no consensus on the definition of the term. Simon Blackburn summarizes the situation in The Oxford Dictionary of Philosophy: "Atheism. Either the lack of belief in a god, or the belief that there is none." Most dictionaries (see the OneLook query for "atheism") first list one of the more narrow definitions.



এথিয়েস্ট অ্যালায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক অনুমোদিত নাস্তিক্যবাদের প্রতীক।

ব্যুৎপত্তি



গ্রীক শব্দ $\alpha\theta\epsilon\omicron\iota$ (atheoi) তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইফিষীয়দের ২:১২ প্যাপিরাস ৪৬-এ দেখা যায়। এর ইংরেজি অনুবাদ হলো "(যারা) ঈশ্বর বিহীন।

প্রারম্ভিক প্রাচীন গ্রিক ভাষায়, বিশেষণ $\acute{\alpha}\theta\epsilon\omicron\varsigma$ (átheos, ব্যক্তিগত $\acute{\alpha}$ - + $\theta\epsilon\acute{o}\varsigma$ থেকে "ঈশ্বর") অর্থ "ঈশ্বরহীন"। এটি প্রথমে কুৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো, মোটামুটিভাবে যার অর্থ ছিলো "অধার্মিক" বা "অপরাধী"। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে, শব্দটি "ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা" বা "ঈশ্বরকে অস্বীকার করা" অর্থে অধিক ইচ্ছাকৃত এবং সক্রিয় ঈশ্বরহীনতা নির্দেশ করতে শুরু করে। এরপর $\alpha\sigma\epsilon\beta\acute{\eta}\varsigma$ (asebēs) শব্দটি যারা স্থানীয় দেবতাদের অসম্মান করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিলো। এমনকি তারা অন্য দেবদেবীতে বিশ্বাস করলেও এই শব্দটি প্রয়োগ করা হতো। ধ্রুপদী পাঠ্যের আধুনিক অনুবাদগুলো কখনও কখনও $\acute{\alpha}\theta\epsilon\omicron\varsigma$ কে "atheistic" বা নিরীশ্বরবাদী হিসেবে অভিহিত করে। একটি বিমূর্ত বিশেষ্য হিসাবে, $\alpha\theta\epsilon\acute{o}\tau\eta\varsigma$ (atheotēs) ব্যবহৃত হতো যার অর্থ, "নাস্তিকতা"। সিসেরো গ্রীক শব্দটিকে ল্যাটিন $\acute{\alpha}\theta\epsilon\omicron\varsigma$ -এ লিপিবদ্ধ করেন। প্রারম্ভিক খ্রিস্টান এবং হেলেনিস্টদের

মধ্যে বিতর্কে শব্দটি নিয়মিত ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় , যেখানে প্রতিটি পক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করতো। [4]

ক্যারেন আর্মস্ট্রং লিখেছেন যে, "১৬ এবং সতেরো শতকে নাস্তিক্যবাদ শব্দটি শুধুমাত্র সম্পূর্ণভাবে বিতর্কিত তর্কশাস্ত্রীয় ছিল... সেসময় নাস্তিক্যবাদ পদবাচ্য টি একপ্রকার অপমানজনক শব্দ ছিল এবং কেউই নিজেকে নাস্তিক হিসেবে অভিহিত করার কথা স্বপ্নেও ভাবত না।" [5]

নিজেকে নাস্তিক হিসেবে অভিহিত করার প্রথম ধাপ শুরু হয় ইউরোপে ১৮ শতকের শেষভাগে। সেসময় বিশেষত একেশ্বরবাদী আব্রাহামিক ঈশ্বরের প্রতি যে অবিশ্বাস তা প্রকাশ করাই ছিল নাস্তিকতা। বিশ শতকে বিশ্বায়নের মাধ্যমের এই শব্দের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য এর অর্থ দাঁড়ায় সর্বপ্রকার দৈবশক্তিতে অবিশ্বাস। যদিও বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে শুধুমাত্র "ঈশ্বরে অবিশ্বাস"কেই সাধারণত নাস্তিক্যবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নাস্তিক্যবাদের প্রসার

দিনদিন মুক্তচিন্তা, সংশয়বাদী চিন্তাধারা এবং ধর্মসমূহের সমালোচনা বৃদ্ধির সাথে সাথে নাস্তিক্যবাদেরও প্রসার ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম কিছু মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার ২.৩% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয় এবং ১১.৯% মানুষ কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করে না। [6] জাপানের ৩১%

⁴ Drachmann, A.B. (১৯৭৭)। *Atheism in Pagan Antiquity*। Chicago: Ares Publishers। আইএসবিএন 978-0-89005-201-3।

⁵ Armstrong 1999

⁶ "Worldwide Adherents of All Religions by Six Continental Areas, Mid-2005". *Encyclopædia Britannica*. 2005. [১]. Retrieved on 2007-04-15.

মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়।^[7]রাশিয়াতে এই সংখ্যা প্রায় ১৩% এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর দেশগুলোতে ১২% নাস্তিক, (৬% শুধুমাত্র ইতালিতেই) থেকে শুরু করে ৪৬% থেকে ৮৫% (সুইডেন) মত।^[৪]

পশ্চিমের দেশগুলোতে নাস্তিকদের সাধারণ ভাবে ধর্মহীন বা পারলৌকিক বিষয় সমূহে অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিছু নাস্তিক ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু ধর্মের দর্শন, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং প্রকৃতিবাদ, বস্তুবাদ ইত্যাদি দর্শনে বিশ্বাস করে। নাস্তিকরা মূলত কোনো বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নয় এবং তারা সকলে বিশেষ কোন আচার অনুষ্ঠানও পালন করে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যে কেউ, যেকোনো মতাদর্শে সমর্থক হতে পারে, নাস্তিকদের মিল শুধুমাত্র এক জায়গাতেই, আর তা হল ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কে অবিশ্বাস করা।

নব-নাস্তিক্যবাদ

একবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন নাস্তিক গবেষক ও সাংবাদিকের প্রচেষ্টায় নাস্তিক্যবাদের একটি নতুন ধারা বেড়ে উঠেছে যাকে "নব-নাস্তিক্যবাদ" বা "New Atheism" নামে ডাকা হয়। ২০০৪ সালে স্যাম হ্যারিসের দি ইন্ড অব ফেইথ: রিলিজান, টেরর, এন্ড দ্যা ফিউচার অব রিজন বইয়ের মাধ্যমে নব-নাস্তিক্যবাদের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে মনে করেন আরেক প্রখ্যাত নব-নাস্তিক ভিক্টর স্টেংগার। প্রকৃতপক্ষে স্যাম হ্যারিসের বই প্রকাশের পর এই ধারায় আরও ছয়টি বই প্রকাশিত হয় যার প্রায় সবগুলোই নিউ

⁷ However, data from the U.S. State Dept. may contradict this figure, since 44% are reported as adherents of Shinto, a polytheistic religion, and information was not provided on the number of respondents identifying with multiple categories. (64% atheists/agnostics/non-believers, plus 44% Shintoists, adds up to more than 100%.)

⁸ Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns" *ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৫ মার্চ ২০১০ তারিখে*, The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, 2005.

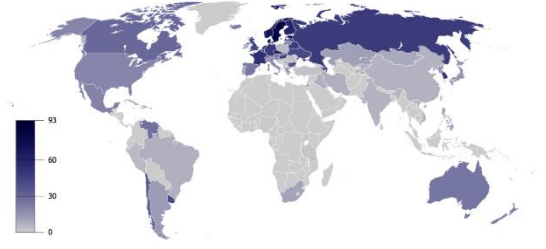
ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলারে স্থান করে নিতে সমর্থ হয়। সব মিলিয়ে নিচের বইগুলোকেই নব-নাস্তিক্যবাদী সাহিত্যের প্রধান উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়:

- দি এন্ড অব ফেইথ: রিলিজান, টেরর, এন্ড দ্যা ফিউচার অব রিজন (২০০৪) – স্যাম হ্যারিস
- লেটার টু এ কৃষ্টিয়ান নেশন (২০০৬) – স্যাম হ্যারিস
- দ্যা গড ডিলিউশন (২০০৬)-রিচার্ড ডকিন্স
- ব্রেকিং দ্যা স্পেল: রিলিজান এ্যাজ এ ন্যাচারাল ফেনোমেনন (২০০৬) – ড্যানিয়েল ডেনেট
- গড: দ্যা ফেইলড হাইপোথিসিস- হাউ সাইন্স শোজ দ্যাট গড ডাজ নট এক্সিস্ট (২০০৭)- ভিক্টর স্টেংগার
- গড ইজ নট গ্রেট: হাউ রিলিজান পয়জনস এভরিথিং (২০০৭) – ক্রিস্টোফার হিচেন্স
- দ্যা নিউ এইথিজম (২০০৯) – ভিক্টর স্টেংগার

শেষোক্ত বইয়ে ভিক্টর স্টেংগার এই ব্যক্তিদেরকেই নব-নাস্তিক্যবাদের প্রধান লেখক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উল্লেখ্য, নব-নাস্তিকেরা ধর্মের সরাসরি বিরোধিতা করেন। তারা ধর্মকে প্রমাণবিহীন বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করেন এবং এ ধরনের বিশ্বাসকে সমাজে যে ধরনের মর্যাদা দেয়া হয় সেটার কঠোর বিরোধিতা করেন।^[৭]

^৭ The New Atheism (২০০৯) - ভিক্টর স্টেংগার; পৃষ্ঠা - ১১-১৩; প্রকাশনী - Prometheus Books

পরিসংখ্যান



পুরো বিশ্বজুড়েই নাস্তিক এবং সংশয়বাদীদের অনুপাত(২০০৭)

এককথায় নাস্তিকের সংখ্যা পরিমাপ করা দুরূহ। বিশ্বাস নিয়ে যে পোল করা হয়েছে সেখানকার উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে নাস্তিক ধর্মবিশ্বাসী আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী এসব কিছুকেই ভিন্ন ভিন্ন পদে অঙ্কিত করা হয়েছে।^[10] একজন হিন্দু নাস্তিক নিজেকে একইসাথে হিন্দু ও নাস্তিক বলে দাবী করতে পারেন।^[11] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ২০১০ সালের জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৯.৬ শতাংশ ধর্মবিশ্বাসহীন এবং ২ শতাংশ নাস্তিক হিসেবে বেড়ে উঠে; যার বিরাট অংশই এশিয়াতে বাস করে। এক্ষেত্রে নাস্তিক্যবাদী ধার্মিক যেমন বৌদ্ধদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ২০০০ থেকে ২০১০ সালে নাস্তিক্যবাদের বাৎসরিক পরিবর্তন হয়েছে ০.১৭%।^[12] বৃহত্তর পরিসরে একটি পরিমাণ থেকে দেখা গিয়েছে, পৃথিবীজুড়ে ঈশ্বরে অবিশ্বাসীর সংখ্যা ৫০ কোটি থেকে ১১০ কোটির কাছাকাছি।

বৈশ্বিক উইন-গ্যালোপ ইন্টারন্যাশনাল জরিপ অনুযায়ী, ২০১২ সালে ১৩% উত্তরদাতা "আশ্বস্ত নাস্তিক"।^[13] ২০১৫ সালের হিসাবে ১১% আশ্বস্ত নাস্তিক (convinced

¹⁰ Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents, Section on accuracy of non-Religious Demographic Data"। ২০১১-০৪-২২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১১-০৪-০৯।

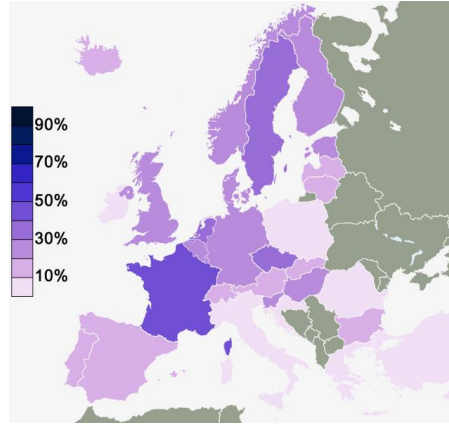
¹¹ Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents, Section on accuracy of non-Religious Demographic Data"। ২০১১-০৪-২২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১১-০৪-০৯।

¹² Religion: Year in Review 2010: Worldwide Adherents of All Religions"। Encyclopædia Britannica Online। Encyclopædia Britannica Inc.। সংগ্রহের তারিখ ২০১৩-১১-২১।

¹³ WIN-Gallup International "Religiosity and Atheism Index" reveals atheists are a small minority in the early years of 21st century"। ৬ আগস্ট ২০১২। ২৫ আগস্ট ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৮ আগস্ট ২০১২।

atheists),^[14] and in 2017, 9% were "convinced atheists". ২০১২-এর হিসাব অনুযায়ী, নিজেদের আশ্বস্ত নাস্তিক হিসেবে দেখে এরূপ শীর্ষ ১০ টি দেশ হলোঃ চীন (৪৭%), জাপান (৩১%), চেক প্রজাতন্ত্র (৩০%), ফ্রান্স (২৯%), দক্ষিণ কোরিয়া (১৫%), জার্মানি (১৫%), নেদারল্যান্ডস (১৪%), অস্ট্রিয়া (১০%), আইসল্যান্ড (১০%), অস্ট্রেলিয়া (১০%), এবং আয়ারল্যান্ড (১০%).^[15]

ইউরোপ মহাদেশ



Percentage of people in various European countries who said: "I don't believe there is any sort of spirit, God or life force." (2010)^[16]

২০১০ সালে ইউরোব্যারোমিটারের পোলে একটি বিবৃতির উপর জরিপ নিয়ে কাজ করা হয়েছিল, বিবৃতিটি ছিল "তুমি ঈশ্বর বা অলৌকিক কোনো কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করো না।" এই বিবৃতিটি সমর্থনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল ফ্রান্সে (৪০%), এরপর

¹⁴ "Wayback Machine" (পিডিএফ)। ২০১৭-১১-১৪। ২০১৭-১১-১৪ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৮-০২-২৭।

¹⁵ "Global Index of Religion and Atheism" (পিডিএফ)। Gallup – Red Cl। ১৬ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা।

¹⁶ "Special Eurobarometer: Biotechnology" (পিডিএফ)। অক্টোবর ২০১০। পৃষ্ঠা 381। ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে মূল (PDF) থেকে আর্কাইভ করা।

যথাক্রমে ফ্রেজ রিপাবলিক (৩৭%), সুইডেন (৩৪%), নেদারল্যান্ড (৩০%), এস্তোনিয়া (২৯%), জার্মানি (২৭%), বেলজিয়াম (২৭%), যুক্তরাজ্য (২৫%), পোল্যান্ডে (৫%), গ্রিস (৪%), সাইপ্রাস (৩%), মাল্টা (২%), এবং রোমানিয়া (১%), ইউরোপীয় ইউনিয়নে সবমিলিয়ে ২০% এই বিবৃতি সমর্থন করে। ২০১২ সালে ইউরোব্যারোমিটার পোল থেকে দেখা গিয়েছে ১৬ শতাংশ মানুষ নিজেদের অবিশ্বাসী/সংশয়বাদী এবং ৭ শতাংশ নিজেদের নাস্তিক ভাবে।^[17]

২০১২ সালের পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপ অনুযায়ী নাস্তিক এবং সংশয়বাদীদের মোট ১৮ শতাংশ ইউরোপীয় নিজেদের ধর্মহীন বলে দাবী করে।^[৮১] একইজরিপ অনুযায়ী ইউরোপের শুধুমাত্র দুইটি দেশে নাস্তিকতার হার সর্বোচ্চ: চেক প্রজাতন্ত্র (৭৫%) এবং এস্তোনিয়া (৬০%)।^[18]

এশিয়া মহাদেশ

নাস্তিকের সংখ্যার ভিত্তিতে চারটি বৃহত্তম দেশ হলো যথাক্রমে: উত্তর কোরিয়া (৭১%), জাপান (৫৭%), হংকং (৫৬%), এবং চীন (৫২%)।^[19]

¹⁷ Discrimination in the EU in 2012" (পিডিএফ), Special Eurobarometer, 383, European Union: European Commission, পৃষ্ঠা 233, ২০১২, ২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৪ আগস্ট ২০১৩ The question asked was "Do you consider yourself to be...?", with a card showing: Catholic, Orthodox, Protestant, Other Christian, Jewish, Muslim, Sikh, Buddhist, Hindu, Atheist, and non-believer/agnostic. Space was given for Other (Spontaneous) and DK. Jewish, Sikh, Buddhist, Hindu did not reach the 1% threshold.

¹⁸ "Religiously Unaffiliated" | Pew Research Center's Religion & Public Life Project | ১৮ ডিসেম্বর ২০১২।

¹⁹ Religion In Australia" | Australian Bureau of Statistics | ২৭ জুন ২০১৭। সংগ্রহের তারিখ ২০১৭-০৬-২৭।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ

অস্ট্রেলিয়া ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্সের জরিপ অনুযায়ী ৩০ শতাংশ অস্ট্রেলীয়দের কোনো ধর্ম নেই।

২০১৩ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৪২ শতাংশ নিউজিল্যান্ডবাসী নিজেদের ধর্ম নেই বলে দাবী করেছে, ১৯৯১ সালে এই পরিমাণ ছিল ৩০ শতাংশ।^[২০]নারীর তুলনায় পুরুষ নিজেকে অধিক ধর্মহীন দাবী করেছে।

আমেরিকা মহাদেশ

২০১৪ সালের ওয়ার্ল্ড ভ্যালু সার্ভের জরিপ অনুযায়ী ৪.৪ শতাংশ মার্কিনী নিজেদের, স্বঘোষিত নাস্তিক ভাবেন।^[২১]যাইহোক, একই জরিপ অনুযায়ী প্রত্যুত্তরে ১১.১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না।^[২১] ১৯৮৪ সালে, যা ছিল ১.১ শতাংশ নাস্তিক এবং ২.২ শতাংশ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। ২০১৪ সালের পিউ রিসার্চ জরিপ মতে ৩.১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে অভিহিত করেন।^[২২]২০১৫ সালে জেনারেল সোশিওলজিক্যাল জরিপ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে নাস্তিক এবং সংশয়বাদীর সংখ্যা ২৩ বছর ধরে প্রায় একই আছে। ১৯৯১ সালে ২ শতাংশ মানুষ নিজেকে নাস্তিক এবং ৪ শতাংশ মানুষ নিজেকে সংশয়বাদী বলে দাবী করে এবং ২০১৪ সালে ৩ শতাংশ মানুষ নিজেকে নাস্তিক ও ৫ শতাংশ মানুষ নিজেকে সংশয়বাদী বলে দাবী করে।^[২৩]

^{২০} সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি। ২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।

^{২১} WVS Database" | World Values Survey | Institute for Comparative Survey Research | মার্চ ২০১৫। ৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।

^{২২} America's Changing Religious Landscape, Pew Research Center, 12 May 2015.

^{২৩} Hout, Michael; Smith, Tom (মার্চ ২০১৫)। "Fewer Americans Affiliate with Organized Religions, Belief and Practice Unchanged: Key Findings from the 2014 General Social Survey" (পিডিএফ)। General Social Survey | NORC

ধর্মহীন

মার্কিন ফ্যামিলী সার্ভের ২০১৭ সালের জরিপ অনুযায়ী ৩৪ শতাংশ নিজেদের ধর্মের সাথে সংযোগহীন বলে দাবী করেন (২৩ শতাংশ কোনো ধর্মের সাথে সংযোগহীন, ৬ শতাংশ সংশয়বাদী, ৫ শতাংশ নাস্তিক)।^[24]^[25] ২০১৪ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টার মতে মার্কিনীদের ২২.৮ শতাংশ নিজেদের কোনো ধর্মের নয় বলে দাবী করেন যার মধ্যে ৩.১ শতাংশ নিজেদের নাস্তিক এবং ৪ শতাংশ সংশয়বাদী বলে দাবী করেন।^[26] পিউরিসার্চ মতে ২৪ শতাংশ মানুষ নিজেদের ধর্মহীন ভাবেন।^[27]

আরব বিশ্ব

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরব বিশ্বে নাস্তিকতার হার বাড়ছে।^[28] সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়মিত অভিযান সত্ত্বেও বড় শহর যেমন কায়রোতে নাস্তিকরা ক্যাফে এবং সামাজিক মাধ্যমগুলোতে মিলিত হয়।^[28] ২০১২ সালের গ্যালোপ ইন্টারন্যাশন্যাল জরিপ অনুযায়ী ৫ শতাংশ সৌদি নিজেদের "আত্মসত্ত নাস্তিক" বলে অভিহিত করেছে।^[28] যাইহোক, আরব বিশ্বে খুব কম সংখ্যক তরুণদের নিজস্ব বন্ধুবৃত্তে বা পরিচিতের মধ্যে নাস্তিক আছে। একটি গবেষণা মতে ১% এর কম মরক্কোতে, মিশরে, সৌদি আরব বা জর্ডানে এবং আরব আমিরাত, বাহরাইন, কুয়েত ও প্যালেস্টাইনে ৩ থেকে ৭ শতাংশ নাস্তিক আছে।^[29] এই দেশগুলোর মানুষকে

²⁴ Nones' are now the biggest religious group in the US – with families torn on priorities" | www.christiantoday.com (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০১৭-১২-০৬।

²⁵ DN American Family Survey 2017" | DeseretNews.com (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০১৭-১২-০৬।

²⁶ America's Changing Religious Landscape" | Pew Research Center: Religion & Public Life | মে ১২, ২০১৫।

²⁷ America's Changing Religious Identity" | PRRI (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০১৭-১২-১৬।

²⁸ The rise of Arab atheism" | সংগ্রহের তারিখ ২০১৬-০২-০৮।

²⁹ Muslim Millennial Attitudes on Religion and Religious Leadership, Arab World, Tabah Foundation, Abu Dhabi, 2016

যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তারা তাদের স্থানীয় এলাকায় নাস্তিক শব্দটি শুনেছে কিনা, সেখানের শুধুমাত্র ৩ থেকে ৮ শতাংশ মানুষ জানায় তারা শুনেছে। একমাত্র আরব আমিরাতে ব্যতিক্রম সেখানের ৫১ শতাংশ মানুষ শুনেছে।^[29]

সম্পদ এবং শিক্ষা

একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে আমেরিকায় সেকুলারিজম এবং নাস্তিক্যবাদের স্তরের সাথে শিক্ষার একটি ইতিবাচক আন্তঃসম্পর্ক জড়িত আছে। বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী নিগেল বারবার মনে করেন, যেসব স্থানের মানুষ নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মনে করছেন নাস্তিক্যবাদের স্ফূরণ সেখানেই ঘটেছে। যেসব স্থানে মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তিত নয়, স্বাস্থ্য সুবিধা পর্যাপ্তভাবে পায়, দীর্ঘায়ু হন সেখানেই নাস্তিকতার উর্ধ্বগতি হয়। বিপরীতক্রমে উন্নয়নশীল দেশে নাস্তিকতার হার ক্রমহ্রাসমান হয়।^[30]

২০০৮ সালের গবেষণামতে গবেষকরা দেখেছেন, ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বুদ্ধিমত্তার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। ১৩৭ দেশের স্যাম্পলে জাতীয় আইকিউ আর অবিশ্বাস এর আন্তঃসম্পর্ক ০.৬।^[31] বিবর্তনীয় মনস্তাত্ত্বিক নিগেল বারবার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেন, নাস্তিকদের বেশি বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য সামাজিক, পরিবেশগত শিক্ষা এবং সম্পদ সংক্রান্ত ফ্যাক্টর দিয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং এসব কিছুই ধর্মীয় বিশ্বাস হ্রাসের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত। ধর্ম বেকুবি তৈরি করে; এবিষয়ে তিনি সন্দিহান। তার কারণ অনেক মানুষ আছেন যারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও ধার্মিক। কিন্তু একইসাথে তিনি বলেছেন এটাও সম্ভব হতে পারে ধর্মবিশ্বাস

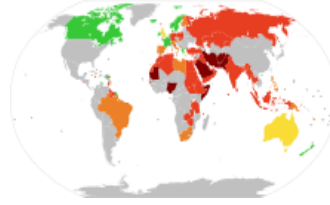
³⁰ Nigel Barber (2010). Why Atheism Will Replace Religion. Psychology Today. Retrieved 2013-05-22.

³¹ Lynn, Richard; Harvey, John; Nyborg, Helmut (২০০৯)। "Average intelligence predicts atheism rates across 137 nations"। Intelligence। 37: 11–15। ডিওআই:10.1016/j.intell.2008.03.004। সংগ্রহের তারিখ ২০১৫-০৫-২৫।

প্রত্যাখানের সাথে উচ্চমাত্রার বুদ্ধিমত্তা একটি সম্পর্ক আছে এবং বুদ্ধিমত্তা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস প্রত্যাখানের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বেশ জটিল।^[32]

২০১৭ সালের গবেষণা মতে, ধর্মিক এবং নাস্তিক এর মধ্যকার তুলনা করলে দেখা যায় নাস্তিকদের বোঝার সক্ষমতাটা অনেক বেশি এর মধ্যকার পার্থক্য বয়স, শিক্ষা, এবং কোন দেশের সেই সামাজিকপরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করেনা অর্থাৎ সমস্ত দেশ বা স্থানে নাস্তিকদের বুঝার সক্ষমতা সর্বোচ্চ থাকে।^[33]

নাস্তিকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী



ধর্ম অবমাননা আইন বিশিষ্ট দেশসমূহ

- ☐ বাতিল করা হয়েছে
- ☐ স্থানীয় বিধিনিষেধ
- ☐ জরিমানা এবং বিধিনিষেধ
- ☒ কারাদণ্ড
- ☐ মৃত্যুদণ্ড

³² Barber, Nigel (৪ মে ২০১০)। "The Real Reason Atheists Have Higher IQs: Is Atheism a Sign of Intelligence?"। Psychology Today।

³³ Daws, Richard E.; Hampshire, Adam (১৯ ডিসেম্বর ২০১৭)। "The Negative Relationship between Reasoning and Religiosity Is Underpinned by a Bias for Intuitive Responses Specifically When Intuition and Logic Are in Conflict"। Frontiers in Psychology। 8: 2191। ডিওআই:10.3389/fpsyg.2017.02191। পিএমআইডি 29312057। পিএমসি 5742220 অবাধে প্রবেশযোগ্য।



ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী দেশসমূহ

পারিসংখ্যানিক ভাবে বিশ্বাস করা হয়, নাস্তিকরা মানসিকভাবে হীন দরিদ্র হয়ে থাকে। বিশ্বাসীরা তো বটেই, এমনকি কিছু নাস্তিক মনে করে, নাস্তিকরা অসৎ চরিত্রের হয়ে থাকে। এই অসৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিরূপ হতে পারে, তার বর্ণনার মধ্যে রয়েছে খুন করা থেকে শুরু করে রেস্তোরায় খাবারের বিল পরিশোধ না করা। ২০১৬ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি প্রকাশনা মধ্যে দেখা গিয়েছে যে ফরাসি মানুষদের ১৫%, ৪৫ শতাংশ আমেরিকান এবং ৯৯% ইন্দোনেশীয় বিশ্বাস করে সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হলে অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস করা প্রয়োজনীয়। [34]

প্রত্যক্ষ বনাম পরোক্ষ

নাস্তিকতাকে কখনো সংজ্ঞায়িত করা হয় এমনভাবে যে, যে ব্যক্তি যেকোনো প্রকার দৈব শক্তিতে অবিশ্বাস করছে, এমনটা হলেই তিনি নাস্তিক। এই বিস্তৃত সংজ্ঞা নবজাত শিশু বা সেসব লোকের জন্যও প্রযোজ্য যারা কোনোরূপ ধর্মবিশ্বাসের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। ১৭৭২ সালে ব্যারন ডি হলব্যাচ বলেন, "সব শিশুই নাস্তিক হয়ে জন্মগ্রহণ করে।" [35]

একইভাবে, জর্জ এইচ স্মিথ (১৭৭৯) বলেন: "যে ব্যক্তি বিশ্বাস করতে হয়, এমন ধর্মের সাথে পরিচিত নয়, সে নাস্তিক। কারণ সে তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করছে না। অর্থাৎ

³⁴ 10 facts about atheists" | Pew Research C

³⁵ Smart, J.C.C. (৯ মার্চ ২০০৪)। "Atheism and Agnosticism" | Stanford Encyclopedia of Philosophy। সংগ্রহের তারিখ ২০১১-০৪-০৯।

এই শ্রেণিতে একজন শিশুও অন্তর্ভুক্ত কারণ সেও ঈশ্বর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয় এবং যেহেতু একজন শিশু ঈশ্বরে বিশ্বাস করছে না, তাই সে নাস্তিক হিসেবেই বিবেচিত।^[36] "স্বজ্ঞানহীন নাস্তিকতা" মানে হল কোন ধর্ম বিশ্বাসকে অসচেতন ভাবে প্রত্যাখ্যান করা এবং "স্বজ্ঞান নাস্তিকতা" মানে হল কোন ধর্ম বিশ্বাসকে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করা। আর্নেস্ট নাগেল তার "ফিলোসফিক্যাল এথিজম" নামক নিবন্ধে ঈশ্বরবাদী বিশ্বাসের কিছুমাত্র অনুপস্থিতিকেই নাস্তিকতার একটি প্রকরণ বলে উল্লেখ করেন।^[37] তবে গ্রাহাম অস্প্লি যেসব মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞাত, তাদের নাস্তিক বলতে নারাজ ছিলেন। তার মতে একমাসের বাচ্চা, মস্তিষ্কে তীব্র আঘাত, ডেমনটিয়ায় আক্রান্ত অসুস্থ মানুষের ঈশ্বর কী এই বিষয়ে বুঝার সক্ষমতা নেই। তাই তিনি তাদের নাস্তিক শব্দের পরিবর্তে নিরীহ বলে উল্লেখ করেন।^[38]

³⁶ Smith 1979, পৃ. 14.

³⁷ Nagel, Ernest (১৯৫৯)। "Philosophical Concepts of Atheism"। Basic Beliefs: The Religious Philosophies of Mankind। Sheridan House। I must begin by stating what sense I am attaching to the word "atheism," and how I am construing the theme of this paper. I shall understand by "atheism" a critique and a denial of the major claims of all varieties of theism. ... atheism is not to be identified with sheer unbelief, or with disbelief in some particular creed of a religious group. Thus, a child who has received no religious instruction and has never heard about God, is not an atheist – for he is not denying any theistic claims. Similarly in the case of an adult who, if he has withdrawn from the faith of his father without reflection or because of frank indifference to any theological issue, is also not an atheist – for such an adult is not challenging theism and not professing any views on the subject. ... I propose to examine some philosophic concepts of atheism ...

reprinted in Critiques of God, edited by Peter A. Angeles, Prometheus Books, 1997.

Oppy 2018, পৃ. 4: Agnostics are distinguished from innocents, who also neither believe that there are gods nor believe that there are no gods, by the fact that they have given consideration to the question whether there are gods. Innocents are those who have never considered the question whether there are gods. Typically, innocents have never considered the question whether there are gods because they are not able to consider that question. How could that be? Well, in order to consider the question whether there are gods, one must understand what it would mean for something to be a god. That is, one needs to have the concept of a god. Those who lack the concept of a god are not able to entertain the thought that there are gods. Consider, for example, one-month-old babies. It is very plausible that one-month-old babies lack the concept of a god. So it is very plausible that one-month-old babies are innocents. Other plausible cases of innocents include chimpanzees, human beings who have suffered severe traumatic brain injuries, and human beings with advanced dementia

³⁸<https://bn.m.wikibooks.org/wiki>

কতজন মানুষ নাস্তিক?

পৃথিবীতে কতজন নাস্তিক আছে তা জানা মুশকিল। তবে একটা কথা, সবাই "নাস্তিক" বলতে একই জিনিস বোঝেন না, নাস্তিকতার সংজ্ঞা বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন। এছাড়াও, কিছু কিছু ধর্ম বিশেষ ধরনের নাস্তিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ফলে একজন ব্যক্তি সেই ধর্ম অনুসরণ করতে পারেন এবং একই সাথে নাস্তিকও হতে পারেন। জৈন ধর্ম এইরকম, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের কিছু রূপও এরকম। এই ধর্মের লোকেরা নিজেদেরকে নাস্তিক না বলে ধর্মের সদস্য হিসাবে বর্ণনা করতে পারেন। আরেকটি সমস্যা হল, কিছু জায়গায় নাস্তিকরা নাস্তিকতার জন্য নির্যাতিত হয়ে থাকেন, তাই সেসব জায়গায় মানুষ নাস্তিকতা স্বীকার করতে রাজি নাও হতে পারে।

এটি অনুমান করা হয়েছে যে বিশ্বের প্রায় বারো শতাংশ নিজেদেরকে "অধর্মীয়" হিসাবে বর্ণনা করে, যা নাস্তিকতার একটি সংজ্ঞা। কিন্তু মাত্র আড়াই শতাংশ নিজেদেরকে 'নাস্তিক' বলে বর্ণনা করেন।^[39]

নাস্তিকতা কোথায় রয়েছে?

নাস্তিকতা সর্বত্র দেখা যায়। নাস্তিকতার যে কোন সংজ্ঞা অনুসারে — আমরা এক মুহূর্তে আলোচনা করব নাস্তিকতা কী? — অন্য কারও কাছ থেকে নাস্তিক বিষয় সম্পর্কে না শিখেও নাস্তিক হওয়া সম্ভব। যেখানে নাস্তিকতা বেশি দেখা যায় সে সম্পর্কে আমরা কিছু জিনিস বলতে পারি। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড এবং ইউরোপীয় দেশগুলিতে নাস্তিকতা মোটামুটি সাধারণ ব্যাপার। সাধারণভাবে এটি কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট ছিল এমন দেশগুলিতেও বেশি সাধারণ - যেমন পুরানো সোভিয়েত ইউনিয়ন, এর উপনিবেশ সমূহ এবং কিউবা; বা চীন এবং চীন প্রভাবিত এলাকা সমূহ। সাম্যবাদের জন্য নাস্তিকতার প্রয়োজন নেই; কিন্তু সেসব দেশে সরকার কমিউনিজম চাপিয়ে দিয়ে

³⁹ <https://bn.m.wikibooks.org/wiki>

সব ধর্মকেও দমন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকায় দক্ষিণাঞ্চলের নাস্তিকতা কিছুটা কম দেখা যায়।^{৩৭}

নাস্তিকতার মূল বিশ্বাসগুলি কি কি?

নাস্তিকরা অনেক কিছু বিশ্বাস করে। কেউ কেউ গভীরভাবে আধ্যাত্মিক মানুষ। ঠিক যেমন অনেক রকমের নাস্তিক আছে—মানুষ যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে (কখনো একজন, কখনো অনেকজন)— ঠিক তেমনই বিভিন্ন ধরনের নাস্তিকও আছে—যারা অন্য যা কিছু বিশ্বাস করে না কেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।

অনেক নাস্তিক সন্দেহবাদ এবং বিজ্ঞানের মূল্যে বিশ্বাসী। এই দুটি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সংশয়বাদ বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং তাদের সমর্থন করার জন্য প্রমাণ চাইছে। বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হল পরীক্ষামূলক প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের ভৌত জগৎ সম্পর্কে আমাদের তত্ত্বগুলি বেছে নেওয়া উচিত।^{৩৭}



উৎফুল্ল মানব, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের প্রতীক

অধর্মীয় নাস্তিকরা প্রায়ই ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী। ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ নৈতিকতা, যৌক্তিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দেয়। এটি বলে যে পৃথিবী অতিপ্রাকৃত প্রাণীর পরিবর্তে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়; এবং যে সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য মানুষের প্রকৃতি থেকে আসে, এবং বিশ্বের এবং মানুষ যেভাবে একসাথে বসবাস করে, তা অতিপ্রাকৃত প্রাণী থেকে নয়।

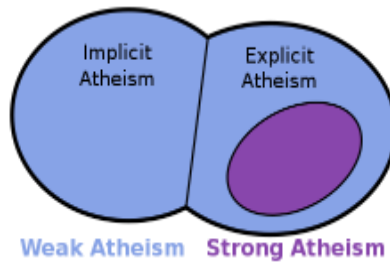
অনেক নাস্তিক, বিশেষ করে অধর্মীয়রা, অন্য লোকেদের বিশ্বাসকে সহ্য করার উপর অনেক গুরুত্ব দেয়। এর অর্থ এই নয় যে, অন্যের বিশ্বাসের সমালোচনা করবেন না; সংশয়বাদের জন্য আমাদের বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে হয়, আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস হোক বা অন্য লোকের। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অন্যদের তাদের বিশ্বাসের জন্য তাড়না করা।

কিছু ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীরা প্রতারণামূলক ধর্ম প্রচার করে। এটি অন্যের বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতাকে উন্নীত করতে পারে, মানুষকে একে অপরের বিশ্বাস থেকে কতটা আলাদা হতে পারে এবং তারা অন্যদের কাছে কতটা অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তা করে; এবং একই সময়ে এটি যথেষ্ট সন্দিহান না হওয়ার বিপদগুলি নির্দেশ করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একটি স্পুফ ধর্ম যা কিছু মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা হল চার্চ অফ দ্য ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার, যাকে

পাস্তাফেরিয়ানিজমও বলা হয়। ২০০৫ সালে, কানসাস স্কুল বোর্ড ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন - এই ধারণা যে বিশ্বের জটিলতা শুধুমাত্র ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে - বিবর্তনের পাশাপাশি জীববিজ্ঞান ক্লাসে শেখানোর জন্য ভোট দেয়। একজন পদার্থবিজ্ঞানের স্নাতক, ববি হেন্ডারসন, বোর্ডকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী একটি উড়ন্ত স্প্যাগেটি দানব দ্বারা তৈরি হয়েছে, তাই তাদের অন্যান্য তত্ত্বের পাশাপাশি এটি শেখানো উচিত। দুই বছর পর বোর্ড তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। আপনি যদি ইন্টারনেটে কাউকে "থ্যাঙ্ক গড" এর পরিবর্তে "থ্যাঙ্ক এফএসএম" বলতে দেখেন, "এফএসএম" মানে "ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার"।

বিভিন্ন ধরনের অবিশ্বাস

নাস্তিকতা শব্দটি অন্তত দুটি ভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হয়। প্রযুক্তিগতভাবে, শব্দের অর্থ "দেবতা ছাড়া"; অর্থাৎ নাস্তিকতা হল কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করা নয়। কিন্তু —সাবধান!— ঈশ্বরে বিশ্বাস না করা কোনো দেবতা নেই বলে বিশ্বাস করা থেকে আলাদা। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করা এমন কিছু নাম রাখে যা আপনি বিশ্বাস করেন না: দেবতা। কোনো দেবতার নাম নেই বলে বিশ্বাস করে আপনি যা বিশ্বাস করেন: আপনি বিশ্বাস করেন যে কোনো দেবতা নেই। "নাস্তিকতা" শব্দটি কখনও কখনও এই জিনিসগুলির একটির জন্য ব্যবহৃত হয়, কখনও কখনও অন্যটির জন্য। তাই তাদের সোজা রাখার জন্য, আমরা তাদের মধ্যে-বিশ্বাসী-কে দুর্বল নাস্তিকতা বলি এবং বিশ্বাসী-এখানে-কোনও শক্তিশালী নাস্তিকতা বলি। সমস্ত শক্তিশালী নাস্তিকই দুর্বল নাস্তিক (কারণ আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না যে তারা করে এবং একই সাথে বিশ্বাস করে যে তাদের অস্তিত্ব নেই)। কিন্তু বেশিরভাগ দুর্বল নাস্তিকই শক্তিশালী নাস্তিক নয় (কারণ তারা সক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করে না ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, না সক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই)।³⁹



বিভিন্ন ধরনের নাস্তিক।

দুর্বল নাস্তিকরা (নীল) অন্তর্দ্বন্দ্ব নাস্তিক এবং স্পষ্ট নাস্তিকদের মধ্যে বিভক্ত। কিছু স্পষ্টবাদী নাস্তিক শক্তিশালী নাস্তিক (বেগুনী)।

কিছু লোক দুর্বল নাস্তিকদের মধ্যেও পার্থক্য করে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিয়ে কখনও চিন্তা করেনি এবং দুর্বল নাস্তিকদের মধ্যে যারা এটা নিয়ে চিন্তা করেছে। দুর্বল নাস্তিক যারা এটা নিয়ে ভাবেননি তাদেরকে বলা হয় অন্তর্নিহিত নাস্তিক। ১৭০০-এর দশকে একজন ফরাসি দার্শনিক ব্যারন ডি'হলবাথ লিখেছিলেন "সকল শিশু জন্মগতভাবে নাস্তিক; তাদের ঈশ্বর সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।" বাচ্চাদের যখন দেবতা সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে না, তখন তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিয়ে ভাবতে পারে না। দুর্বল নাস্তিকরা যারা এটি সম্পর্কে চিন্তা করেছেন তাদেরকে স্পষ্ট নাস্তিক বলা হয়।

আরেকটি শব্দ আছে যা আপনি শুনেছেন: অজ্ঞেয়বাদী। লোকেরা কখনও কখনও এই শব্দটি এমন কাউকে বোঝাতে ব্যবহার করে যার ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা সে সম্পর্কে কোনও মতামত নেই - একজন দুর্বল নাস্তিক। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদী শব্দটি আসলে তৈরি করা হয়েছিল (অর্থাৎ একটি শব্দ হিসেবে উদ্ভাবিত) বিশেষভাবে এর থেকে ভিন্ন কিছু বোঝাতে। এটি ১৮৬৯ সালে টমাস হেনরি হাক্সলি নামে একজন ইংরেজ জীববিজ্ঞানী দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, যিনি চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে প্রচার করেছিলেন। তিনি এই শব্দের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এমন কাউকে বোঝাতে যিনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা তা জানা অসম্ভব। হ্যাঁ, এটি এমন কিছুর নামকরণ যা অজ্ঞেয়বাদীরা বিশ্বাস করে: তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি না তা জানা নেই।

নাস্তিকতা অনুশীলনে কিছু প্রধান ছুটির দিন কি কি?

১৯৯০ এর দশক থেকে, ১২ ফেব্রুয়ারি ডারউইন দিবস পালন করা হচ্ছে, যা বিবর্তন আবিষ্কারক চার্লস ডারউইনের জন্মবার্ষিকীতে তার স্মরণে। চার্লস ডারউইনকে স্মরণ করতে চাইলে আপনাকে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী হতে হবে না, তবে এটি ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীদের মধ্যে কিছু জনপ্রিয়তা উপভোগ করে।

স্পুফ ধর্ম পাস্তাফেরিয়ানিজমের বেশ কয়েকটি ছুটি রয়েছে। একটি পাস্তাফেরিয়ান ছুটি, যাকে সাধারণভাবে হলিডে বলা হয়, বছরের একই সময়ে বড়দিন, কোয়ানজা এবং হানুক্কাহ হয় এবং এর কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। সুতরাং, "শুভ ছুটির দিন" বা "ছুটির শুভেচ্ছা" শব্দগুচ্ছের যেকোনো ব্যবহারকে পাস্তাফেরিয়ানিজমের সমর্থনের প্রমাণ বলে দাবি করা হয়।³⁹

বিতর্কের উৎস

মুন্ডমনা দাবি করা নাস্তিকদের প্রায়ই দাবি করতে দেখা যায় যে, “মানুষের ধর্ম, সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস এগুলোর উৎস পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা ইত্যাদি। সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, এগুলো সহজাতভাবে উঠে আসেনা। বরং পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র তাকে যে বিশ্বাস লালন করতে শিখিয়ে দেয় সে তাই করে। এবং মানুষ সে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে, পবিত্র বলে মনে করে।”

সুতরাং ধর্ম , সৃষ্টিকর্তা, বলতে আসলে কিছুই নেই।

মুন্ডমনা নাস্তিকদের এহেন দাবির কারণ, যদি মানুষের মনে অতি প্রাকৃতিক ভাবে কোনো বিশ্বাস থেকে থাকে তাহলে একজন অতি-প্রাকৃতিক সত্তার থাকা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়।

যেহেতু নাস্তিকতা বলতে এমন কিছুকে বুঝানো হয়, যেখানে সৃষ্টিকর্তা বা অতি-প্রাকৃতিক সত্তা বলতে কিছুই থাকতে পারেনা। সেহেতু যদি অতি-প্রাকৃতিক সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে নাস্তিক্যবাদ অচল হয়ে পরবে।^[40]

⁴⁰ <https://www.frommuslims.com>

সহজাত বিশ্বাসের প্রমাণ

নাস্তিকদের দাবি কতটুকু যৌক্তিক? আসলেই কি ধর্ম, সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস আমাদের সমাজ,পরিবার, আমাদের উপর চাপিয়ে দেয় ? আর আমরা তা অন্ধভাবে মেনে নেই? আমাদের কি সত্য-মিথ্যা বোঝার সহজাত প্রবণতাও নেই?

যদি সত্যি তাই হয় তাহলে নাস্তিকতাই তো ঢের যৌক্তিক !

কিন্তু সত্য এটাই যে নাস্তিকতা স্বভাবজাত কিছু নয় বরং ধর্ম, সৃষ্টিকর্তা,এগুলোই হচ্ছে স্বভাবজাত।

এবং এই সহজাত বিশ্বাসই নাস্তিক্যবাদকে ধুমড়ে মুচড়ে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

একদল শিশুকে কোনো এক জনমানবহীন, শহর থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একটি দ্বীপে রেখে আসা হলো। সেখানে তারা নিজেরাই বেড়ে উঠতে লাগলো। সেখানে তারা কি এই বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠবে যে জগত অস্তিত্বে আসার জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব রয়েছে ?

নাকি এমন বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠবে যে এই জগতের অস্তিত্বের জন্য কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই? কিংবা থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই?

একজন নাস্তিক হয়তো খুব সহজেই উত্তর দিবে হ্যাঁ অবশ্যই সে এমন বিশ্বাস নিয়ে জন্ম নিবে যে, জগৎ অস্তিত্বে আসার জন্য কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু কগনিটিভ সাইন্টিস্ট ও গবেষকগণ উল্টো সুরের ফলাফলই পাচ্ছেন!

গবেষকদের দাবি অনুযায়ী শিশুরা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের পূর্বধারণা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ শিশুরা প্রাকৃতিক ভাবেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে জন্মায়। তাই ধর্ম, সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস এগুলো পরিবার,সমাজ,রাষ্ট্র আমাদের উপর চাপিয়ে দেয় আর আমরা তা অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরি নাস্তিকদের এহেন দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

University of Oxford এর Centre for Anthropology and Mind বিভাগের সিনিয়র রিসার্চার Dr. Justin barrott দীর্ঘ ১০ বছর ধরে শিশুদের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে বলেছেন,

“Human beings are natural believers in God.” অর্থাৎ, মানুষ স্বভাবতই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ^[41]^[42]

অস্তিত্ব, মহাবিশ্বের ঐশ্বরিক সৃষ্টি, মনের অস্তিত্ব, পরকালের বিশ্বাস ইত্যাদি।^[43]

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের (নাস্তিক) গবেষক ডেবোরাহ কেলেমেন “শিশুরা কি সহজাতভাবে আস্তিক?” এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ বের করেছেন। এবং সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে,

সম্প্রতি মননগত গবেষণায় দেখা যায় যে, ৫ বছরের দিকে শিশুরা বুঝতে শুরু করে প্রাকৃতিক বস্তু গুলো মানব সৃষ্ট নয়। ৬-১০ বছর বয়সী শিশুরা প্রকৃতির মাঝে একটা মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। এসব গবেষণা থেকে শিশুদের ব্যাক্সামূলক মনোভাবকে সহজাত আস্তিক্যবাদ হিসেবে বলা যেতে পারে। ^[44]

এছাড়াও ডেবোরাহ কেলেমেন বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত জানান যে, “অতিপ্রাকৃতিক সত্তায় ধর্মীয় বিশ্বাস বাহ্যিক, সামাজিক উৎস থেকে নয় বরং, প্রাথমিকভাবে মানুষের ভেতর থেকেই উৎপত্তি হয়। এ বিশ্বাস মানব মনের মৌলিক উপকরণ।” ^[45]

⁴¹ Children are born believers in God, academic claims, Martin Beckford, 24 Nov 2008 – The Telegraph.

⁴² Are We Born Believers? by Dr. Benjamin Wiker (8 May 2012)

⁴³ Religion is natural by Paul Bloom (2006), Department of Psychology, Yale University, USA – Developmental Science 10:1 (2007), pp 147–151, DOI 10.1111/j.1467-7687.2007.00577.x

⁴⁴ Are Children “Intuitive Theists”? Reasoning About Purpose and Design in Nature. Published in 2004

⁴⁵ Patrick Mcnamara Ph.D, Wesley J. Wildman (etd.), Science and the World’s Religions, vol. 02 (persons and Groups), p.206,209 (Publisher ABC-CLIO, July 19,2012)

এলিনা জার্নেফেল্ট, কেটলিন এফ.ক্যানফিল্ড এবং ডোবোরাহ কেলেমেন সাম্প্রতি একটি গবেষণা করেছে “অবিশ্বাসীদের বিভক্ত চিন্তাধারা; বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিধার্মিক প্রাপ্ত বয়স্কদের মাঝে প্রকৃতির উদ্দেশ্যমূলক

নিঃসন্দেহে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছে।”^[46]

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রজার ট্রিগ এর মতে,

“ধর্মকে দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ক্ষণস্থায়ী কারণ ধর্মবিশ্বাস মানব মনে গ্রথিত বলেই প্রতীয়মান হয়।”^[47]

বিখ্যাত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে এসেছে,

প্রাথমিক-স্কুল বয়সে, শিশুরা তাদের চারপাশের জগতের জটিলতা ব্যাখ্যা করার জন্য একজন চূড়ান্ত ঈশ্বর-সদৃশ ডিজাইনারকে ডাকতে শুরু করে-এমনকি নাস্তিক হিসাবে বেড়ে ওঠা শিশুরাও!^[48]

আর অন্যদিকে নাস্তিক মনোবিজ্ঞানি প্যাসকেল বয়ার Nature জার্নালে প্রকাশিত পেপারে উল্লেখ করেছেন,

“নাস্তিকতা হলো আমাদের সহজাত চেতনার(Natural Cognitive disposition) বিরুদ্ধে।”^[49]

⁴⁶ Elizabeth king, I’m an atheist. So why can’t I shake God? The washington post, February 4,2016

⁴⁷ Tim Ross, Belief in God is part of human nature – Oxford study. The Telegraph, 12 May 2011

⁴⁸ Oumanski, P. See Jane Evolve: Picture Books Explain Darwin. Wall Street Journal: Life and Culture. 2014
বিকল্পঃ Wayback Machine কর্তৃক আর্কাইভকৃত ভাৰ্শন, April 19 2014

⁴⁹ Pascal Boyer, Bound to Believe? – Nature 2008 ,vol 455, pg 1038-1038

ফিলোসফির দৃষ্টিতে সহজাত বিশ্বাস

সহজাত বিশ্বাসকে ফিলোসফির ভাষায় সেলফ এভিডেন্স ট্রুথ বা ফাস্ট প্রিন্সিপাল বলে।

এভিডেন্স ট্রুথ বা ফাস্ট প্রিন্সিপাল কি ?

ফাস্ট প্রিন্সিপাল বলতে বুঝায়, যে সব কিছু আমরা কোনো প্রকার লজিক বা প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করি।

যেমনঃ আমাদের এই মহাবিশ্ব বা $2+2=4$ ইত্যাদি।

যে জীবনকে আমরা বাস্তব বলে মনে করি এই জীবন কি স্রেফ স্বপনের মতো কোনো ব্যাপার ? নাকি আদৌ এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে ? আপনি কি কখনো প্রমাণ করতে পারবেন আপনার এই জীবন আসলেই বাস্তব ? আমরা কখনো আমাদের এক্সট্রানাল ওয়ার্ল্ড বাস্তবে অস্তিত্বশীল তা প্রমাণ করতে পারবোনা।

যদি আমরা প্রমাণ করতে যায় তহলে প্রথমে আমাদের কনসাসনেসকে প্রমাণ করতে হবে। তো আমাদের কনসাসনেস নির্ভরযোগ্য এটা কিভাবে প্রমাণ করবো ? এটাকে প্রমাণ করতে হলে আমাদের অন্য একটি কনসাসনেস লাগবে। কিন্তু সেটা পসিবল না।

আমরা এক্সট্রানাল ইউনিভার্স বাস্তবে অস্তিত্বে আছে কিনা তা প্রমাণ করতে পারবোনা। কিন্তু এর মানে এই না যে আমরা এক্সট্রানাল ইউনিভার্সের অস্তিত্বকে নাকচ করে দিব। বরং আমরা কোনো যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই প্রকৃতিগত ভাবেই আমরা এই জগতকে বাস্তব বলে মনে করি।

আমরা কারো সাথে কথা বলার সময় যারা সাথে কথা বলি তার অস্তিত্বের প্রমাণ চেয়ে কথা বলি। মনে করেন আপনার বন্ধু আপনাকে ডাকতে আসলো বাসায়। তখন নিশ্চয় আপনি তাকে বলেন না যে আগে তুই তোর অস্তিত্বের প্রমাণ দে তাহলে আমি

তোর সাথে কথা বলবো! কারণ তুই মানুষ না হয়ে ভিনগ্রহের কোনো প্রাণীও তো হতে পারিস! বা রোবট ও হতে পারিস।

আমরা প্রকৃতিগত ভাবেই বিশ্বাস করি যে আমার বন্ধু আসলেই রিয়েল।

এই যে আমরা কোনো যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই প্রকৃতিগত ভাবেই বিশ্বাস করি নিচ্ছি এটাই হচ্ছে ফাস্ট প্রিন্সিপাল।

সুতরাং প্রকৃতিগত ভাবেই আমরা অনেক কিছুইর উপর বিশ্বাস নিয়ে জন্মগ্রহণ করি।

ইসলামের দৃষ্টিতে সহজাত বিশ্বাস

“ফিতরাহ থেকেই একজন নিপুণ স্রষ্টার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই জ্ঞান অমোচনীয়, অনিবার্য এবং সুস্পষ্ট।”^[50]

এছাড়াও, ইবনু তাইমিয়া ফিতরা সম্পর্কে বলেছেন,

“একজন সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস সকল মানুষের অন্তরে গাঁথা আছে, একটা তাদের সৃষ্টির আবশ্যিক শর্ত থেকে।”^[51]

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শায়েখ সাঈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) ফিতরাত সম্পর্কে বলেন,

“যে মানুষ আল্লাহকে চেনেনা, যে তাকে অস্বীকার করে, যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পূজা করে এবং আল্লাহর কর্তিত্বের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার করে, স্বভাব প্রকৃতির (ফিতরাত) দিক দিয়ে সেও মুসলিম, কারণ তার জীবন মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহর বিধানের অনুসারী।..... যে মাথাকে জোরপূর্বক আল্লাহ ছাড়া অপরের সামনে

⁵⁰ মাজমু আল-ফাতওয়া শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়া, মাদিনা; মুজামা'মালিক হাদাদ (১৬/৩২৪

⁵¹ দার তারুদ আল-আকল ওয়ান-নাকল, ২য় সংস্করণ, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ রাশাদ সালিম, জামিআ আল-মুহাম্মদ বিন সাউদ আল-ইসলামিয়া। খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৮২

অবনত করছে, সেও জন্মগতভাবে মুসলিম, অজ্ঞতার বশে যে হৃদয় মধ্যে সে অপরের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করে, তাও সহজাত প্রকৃতিতে মুসলিম।^[52]

নাস্তিকতা কি স্বভাবজাত?

নাস্তিকতা কোনো সহজাত বিশ্বাস বা জন্মগত বিশ্বাস নয়।

নাস্তিক হতে হলে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা ও ফিলোসফিক্যাল আর্গুমেন্ট থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস আমাদের জন্মগত বিশ্বাস।

তো জন্মগত কোনো বিশ্বাস বা সহজাত বিশ্বাসের বিপক্ষে অবস্থান নিতে হলে তা অবশ্যই “অর্জিত অবস্থানই হবে”। আর এখানে “প্রমাণের অভাবে স্রষ্টাকে অস্বীকার”- এই যুক্তিটিও খাটলো না, স্বতঃসিদ্ধকে ডিসপ্রুভ করা যায় না। চাইলে অন্ধবিশ্বাসীরা চেষ্টা করে দেখতে পারেন!

যেহেতু আমরা প্রাথমিক ভাবে একজন সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস পেয়ে থাকি সেহেতু সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ আছে কিনা এমন প্রশ্নের পরিবর্তে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে সৃষ্টিকর্তা যে নাই সেটার কোনো প্রমাণ আছে কিনা?

আপনাকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে,

হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে?
^[53]

এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

⁵² সাঈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী; ইসলাম পরিচিতি, পৃষ্ঠা নং- ৮

⁵³ কুরআন, সূরা আল-ইনফিতার ৮২:৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ প্রশ্ন উত্তর

১. সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে ?

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কীয় বিতর্কে বস্তাপচা নাস্তিকীয় যে আপত্তি শোনা যায়: সব কিছুর যদি সৃষ্টিকর্তা থাকে তাহলে সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে ? বা আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন ? মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসার জন্য একজন সর্বশক্তিমান অনাদি স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করার পর, সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে ? এই ধরনের প্রশ্ন একেবারেই অবাস্তব ও শিশুসুলভ। নাস্তিকদের শিশুসুলভ এই যুক্তিটি খোলাসা করছি!

আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন ?

সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে। যে সর্বশক্তিমান সত্তা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তিনি সৃষ্ট নয়। বরং তিনি স্রষ্টা। তিনি এই জগতের নিয়মকানুনের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়।

আমাদের জগতের প্রতিটি বস্তু অস্তিত্বে আসার জন্য কোনো না কোনো কিছুর নির্ভরশীল। যেমন, আপনি এই মূহুর্তে যে ডিভাইস দিয়ে লিখাটি পড়ছেন এই ডিভাইস অস্তিত্বে আসার জন্য ডিভাইসটি প্রস্তুত করার জন্য যে-সকল উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর নির্ভরশীল। সে উপাদান গুলো আবার অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল। তো আমরা এমন নির্ভরশীলতা দেখতে পায় আমাদের এই মহাবিশ্বের ভেতরে থাকা প্রতিটি বস্তুর জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা কি মহাবিশ্বের কোনো অংশ ? বা সৃষ্টিকর্তা কি মহাবিশ্বের ভেতরেই অবস্থান করছে?

আচ্ছা বলুন তো, যে ডিভাইস দিয়ে আপনি লিখাটি পড়ছেন সেই ডিভাইসের প্রস্তুতকারীকে ডিভাইসের ভেতরে খুঁজে পাবেন ?

সৃষ্টিকর্তা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি এই মহাবিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মহাবিশ্বের সব কিছুই কিছু না কিছুর উপর নির্ভরশীল বলে, একই যুক্তি যদি সৃষ্টিকর্তার উপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিকতা দেখা দেয়।

আমরা আমাদের অস্তিত্বের কারণ খুঁজতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তার ধারণা পেয়ে থাকি। সৃষ্টিকর্তা এমন কিছু নয় যাকে আমরা এম্পিরিক্যালি দেখতে পাবো বা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে খুঁজে পাবো। বরং সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে পরম সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব হচ্ছে অনিবার্য। তার অনস্তিত্ব থাকাটা অসম্ভব, কেননা তার অস্তিত্ব থাকতেই হবে। কিন্তু আমরা হচ্ছে পার্টিকুলার বিং। আমাদের অস্তিত্ব থাকা এবং না থাকা দুটোই সম্ভব। এবং আমাদের অস্তিত্ব অনিবার্য নয়। আমি অস্তিত্বে নাও আসতে পারতাম।

সম্ভাব্য অস্তিত্বশীল জিনিসের ক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা অবসম্ভাব্য অস্তিত্ব (যার অস্তিত্ব থাকাই লাগবে) হওয়ার কারণে তার কোনো কারণের প্রয়োজন নেই। কারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী তার অনস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব। এবং তিনি অসীম সত্তা। তাই সম্ভাব্য অস্তিত্বশীল সব কিছু অস্তিত্বে আসার জন্য যদি কোনো না কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে অসীম সত্তাও তার অস্তিত্বে আসার জন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হতেই হবে এমনটা নয়। যদি অসীম সত্তা তার অস্তিত্বে আসার জন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে অসীম সত্তা ও সসীম সত্তার মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? বা তিনি কিভাবে অসীম থাকে?

পার্টিকুলার সত্তা এবং অসীম সত্তা দুটো আলাদা ক্যাটাগরি। সুতরাং, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে বা সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? এই প্রশ্নে প্রশ্নকারি ক্যাটাগরি মিস্টেক ফ্যলাসি করে। বিবাহিত এবং কুমার যেমন একই ক্যাটাগরিতে পরেনা, তেমনি পার্টিকুলার এবং অসীমও একই ক্যাটাগরিতে পরে না। সৃষ্টি ও স্রষ্টাও একই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত নয়।

এছাড়া, সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রার্থক্য বুঝলে এই ধরনে অবান্তর প্রশ্ন কারো মাথায় ঘুর-পাক খাওয়ার কথা নয়। সৃষ্টি বলতে বুঝায়, যা কিছু একটা সময় অস্তিত্বে ছিলোনা এবং

একটা নির্দিষ্ট সময়ে অস্তিত্বে এসেছে। নাস্তিকদের প্রশ্ন অনুযায়ী যদি আমরা ধরে নেয় যে সৃষ্টিকর্তারও স্রষ্টা থাকা আবশ্যিক। তার মানে, সৃষ্টিকর্তা একটা সময়ে অস্তিত্বে ছিলোনা এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর অস্তিত্বে এসেছে। তো যে-সকল নাস্তিক এমন চমক প্রদক প্রশ্ন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, সৃষ্টিকর্তাকে যদি সৃষ্টি হতে হয় তাহলে তিনি কি আর সৃষ্টিকর্তা থাকে নাকি সৃষ্টি হয়ে যায় ?

মনে করুন, X হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা। এখন X যদি X1 থেকে সৃষ্টি লাভ করে তাহলে X কি সৃষ্টিকর্তা হবে নাকি সৃষ্টি হবে ? অবশ্যই সৃষ্টি হবে। তাহলে এই প্রশ্ন অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তাকেই সৃষ্টি হতে হচ্ছে, যা সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতির বিপক্ষে অবস্থান করে।

এছাড়া, সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে এটা একটা লোডেড কুয়েশন ফ্যালাসি বা কমপ্লেক্স কুয়েশন ফ্যালাসি। যেটা যেটি কোন controversial বা unjustified assumption করে করা হয়। কারণ, প্রশ্নকারী এখানে আগেই ধরে নিয়েছে যে সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি হতে হবে। কিন্তু এটা শুধুমাত্রই অনুমান। এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। বিষয়টা অনেকটা এমন যে, আপনাকে ছুট করে একজন এসে জিজ্ঞেস করলো "আপনি কি এখনো বউ পেটান?" যে আপনাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছে প্রথমত সে ধরে নিয়েছে আপনার বউ আছে, এবং আপনি তাকে পেটাতেন। সৃষ্টিকর্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি অসীম সত্তা, যার কোনো শুরু নেই। অর্থাৎ তিনি অসৃষ্টি।

সৃষ্টিকর্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী, তিনি অসৃষ্টি স্রষ্টা, কোনো অনস্তিত্বশীল অবস্থা থেকে তিনি অস্তিত্বে আসেনি। যার শুরু নেই তা কখনো সৃষ্টি হতে পারেনা। তিনি অসীম। অসীম সত্তা কোনো কিছু থেকে সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি হতো তাহলে তা আর অসীম থাকেনা।

মনে করুন, X হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি অসীম সত্তা যার কোনো শুরু নেই। এখন ধরে নিলাম, X কে X1 সৃষ্টি করলো। তো যৌক্তিক মনে কিন্তু আবারো প্রশ্ন আসবে তাহলে X1কে কে সৃষ্টি করেছে ? ধরুন, X1 কে X2 সৃষ্টি করলো। আপনি কিন্তু

আবারো প্রশ্ন করবেন যে তাহলে X2 কে কে সৃষ্টি করেছে ? উত্তর আসলো X2 কে X3 সৃষ্টি করেছে। এভাবে আপনি অসীম সংখ্যকবার প্রশ্নকরতে পারবেন। তারমানে হলো আপনার প্রশ্ন করার ক্রমধারা কখনোই শেষ হবেনা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এভাবে যদি সৃষ্টিকর্তার পিছনে আরো অসীম সংখ্যক সৃষ্টিকর্তা থাকে তাহলে আমরা কখনোই বর্তমান সময়ে পৌঁছাতে পারতাম না।

কেননা X অস্তিত্বে আসার জন্য নির্ভর করে X1 এর উপর, আবার X1 অস্তিত্বে আসার জন্য নির্ভর করে X2 এর উপর, X2 অস্তিত্বে আসার জন্য নির্ভর করে X3 এর উপর। এভাবে অনন্তকাল চলতে থাকলে X অস্তিত্বে আসার জন্য নির্ভর করে অনাদিকাল ধরে চলা সৃষ্ট কিছু উপর। তো অনাদিকাল বা অসীম কাল ধরে নির্ভরশীলতার এই ক্রমধারা কখনোই শেষ হবেনা। এইভাবে অনাদিকাল ধরে চলা সৃষ্ট কিছু উপর নির্ভর করলে “অনবস্থা দোষ”(Infinite regress) দেখা দিবে। যার ফলে বর্তমান সময়েই আসা সম্ভব হতোনা। সুতরাং, ইউনিভার্স সৃষ্টির কারণ যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তাহলে সৃষ্টিকর্তার জন্য অসীম সংখ্যক কারণের প্রয়োজন নেই। বরং শুরুতে এমন একজন স্রষ্টা থাকা অনিবার্য যার পিছনে আর কোনো স্রষ্টা নেই, যিনি হচ্ছে অসীম।

এছাড়া, Law of parsimony (মিতব্যয়িতা নিয়ম) অনুসারে, একই জিনিসের একটি মাত্র কারণ থাকা সম্ভব। তাহলে এই ইউনিভার্সের একটি মাত্র কারণ থাকা সম্ভব। এবং সেই কারণই হলো সৃষ্টিকর্তা।

কুরআনের মত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে তার পরিচয় এভাবেই দিয়েছেন,

বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।

আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।

এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।^[54]

দার্শনিকদের মতামত

অধ্যাপক এন্টনি ফ্লিউয়ের দেয়ার ইজ গড বইয়ের পরিশিষ্টে অধ্যাপক আব্রাহাম ভার্গসে জোরালোভাবে বলেছে,

আস্তিক নাস্তিক একটি বিষয়ে একমত হতে পারে: যদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে, তা হলে এর আগে অবশ্যই এমন কিছু থাকতে হবে যা সব সময় অস্তিত্বশীল। চিরকালীন অস্তিত্ববান এই সত্তা কীভাবে এসেছে? এর উত্তর হলো, এটা কোনোভাবেই আসেনি। এটা সবসময় অস্তিত্ববান।^[55]

তথ্যসূত্র: <https://faith-and-theology.com>

২. আল্লাহ কেনো কোনো মহিলা নবী প্রেরণ করেনি?

প্রশ্ন--আল্লাহ যত নবী পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তাদের মধ্যে একজনও কেন মহিলা নেই? পুরুষকে কেন নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্।

দায়িত্বের সমবন্টন ও ন্যায়বিচার-

সাধারণ মানুষের চাইতে নবীগনের বেশি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং তা সমাধান করতে হয়। উদাহরণ দ্বারা বলা যায়-

✓ নবীকে নামাযে ইমামতি করতে হবে যদি মহিলা ইমাম হয় আর পুরুষরা পেছনে থাকে তাহলেই আল্লাহর দিকে মনযোগের চাইতে উক্ত মহিলার দিকে মনযোগ বেশি যাবে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান সেটাই প্রমাণ করে।

⁵⁴ সূরা আল-ইখলাস; ১১২ঃ১-৪

⁵⁵ দেয়ার ইজ আ গড: হাউ দা ওয়ার্ল্ড'স মস্ট নটরিয়াস এথিস্ট চেইনজড হিজ মাইন্ড। পৃষ্ঠা নং-১৬৫

✓ পয়গম্বরকে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে হয়। হাত মেলাতে হয় যা শরীয়া অনুযায়ী নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, একজন পুরুষ নবী সহজে করতে পারে।

✓ নবীকে অনেক মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে যা নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়,

✓ সরকার প্রধান যদি মহিলা হয় তাহলে বিভিন্ন সময় ব্যক্তিবর্গের সাথে রুদ্ধদ্বার ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা করতে হয় যা ইসলামের আইনের খেলাফ,

✓ এছাড়া নারীগনকে বাচ্চা ১০ মাস ১০দিন গর্ভে ধারণ করতে হয়। সংসার ছেলে-মেয়ে দেখাশুনা করতে হয় তার উপর যদি নবীর দায়িত্ব এলে তাহলে তা অবিচার হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন-

“আমি ন্যায়বিচারক ও দয়ালু,

আল্লাহ নারীগনকে পবিত্র কুরআন অনেক সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে বিবি মারিয়ম (আঃ) তিনি সমস্ত পৃথিবীর নারীশ্রেষ্ঠা, হযরত আয়েশা হযরত ফাতেমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহতাআলা দায়িত্বের সমবন্টন করার ক্ষেত্রেই নারীগনকে নবী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠাননি।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।^[56]

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

৩. ইসলামে নিজের ইচ্ছে বলতে কিছুই নেই

প্রশ্ন :-যদি আল্লাহর ইচ্ছাই সব হয়ে থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ

আল্লাহ বলেন-

⁵⁶ <https://islamicask.com>

”একটি পাতাও পরেনা আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া। সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে, ”

আমৃত্যু স্বাধীন ইচ্ছা,একটা পরীক্ষা-

তবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইচ্ছা আছে উদাহরন দ্বারা বলা যায়,

ধরুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে আপনার বাড়ি তথা প্রত্যেক এলাকার বিদ্যুৎ আসে। যদি কেউ নিজের আঙ্গুল কারেন্টের লাইনে রাখে সে ধাক্কা খাবে।

এটা তার দোষ, আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন সে ইচ্ছে করলে বিদ্যুৎ হাত দেবে আর ইচ্ছা না করলে দেবেনা।

কিন্তু তার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দায়ী করা যাবেনা সুতরাং দোষটা পড়ে পুরুপুরি মানুষের- কেন সে বিদ্যুতে হাত দিলো?

আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন কারন প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা এক একটা পরীক্ষা।

জীবন পদ্ধতির সঠিক নিয়ম-কানুন-

আল্লাহ পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ﷺ) জীবনাদর্শে প্রকাশ করেছেন। সে যদি অনুসরন করে যত বছরই সে বাচুক ২০ বছর ৫০ বছর ১০০ বছর তার জীবন পদ্ধতির ও স্বাধীন ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই বিচারের ফলাফল আল্লাহ প্রকাশ করবেন। আর যে যদি সেভাবে অনুসরন না করে সে অকৃতকার্য, আল্লাহ বলেন সুরা মুলক-৬৭: আয়াত-২-

“ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের যাচাই করতে যে তোমাদের মধ্যে কে কাজেকর্মে শ্রেষ্ঠ।’

আল্লাহ বলেন সুরা আনকাবুত ২৯: ২-৭

(২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

(৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।

(৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ।

(৫) যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া।

(৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।^{১৬}

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

৪. মুসলিম কি প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করে?

প্রশ্নঃ- ইসলাম আকার বা মূর্তি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু তারা নিজেরাই কেন প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করে?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

কা'বা মুসলিমদের 'কেবলা'। মুসলিমরা তাদের প্রার্থনায় দিক নির্দেশক হিসেবে গণ্য করে। এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, মুসলিমরা তাদের প্রার্থনায় কা'বার দিকে মুখ করে বটে তবে তারা কাবা ঘরের উপাসনা করে না। উপাসনা করে সেই ঘরের মালিক অদৃশ্য আল্লাহ তা'আলার। জ্যোতীর্ময় কুরআনে বলা হয়েছেঃ-

“তোমার (নির্দেশনার জন্য) বার বার আকাশের দিকে করে তাকানো আমরা দেখেছি। এখন আমরা কি তোমাকে ঘুরিয়ে দেব সেই কেবলার দিকে যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে? তাহলে ঘুরিয়ে নাও তোমরা থাকনা কেন (নামাযে) তার দিকেই মুখ ফিরিয়ে নেবে।”

ক. ইসলাম চূড়ান্ত ঐক্যকে উৎসাহিত করে যেমন, মুসলিমরা যদি নামায আদায় করতে চায় তাহলে এমনটা হতেই পারে যে, কারো ইচ্ছা হবে উত্তর দিকে ফিরে নামায পড়তে, কারো ইচ্ছা হবে দক্ষিণ দিকে দিকে ফিরতে।

তাই উপাসনার ক্ষেত্রেও মুসলিমদের চূড়ান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যেখানেই তারা থাকনা কেন এক আল্লাহর প্রতি এক মুখী হয়ে তাদের নামায আদায় করতে বলা হয়েছে। ‘কাবা’ সেই একটি দিকের দিক-নির্দেশক, অন্য কিছুই নয়। কাবার পশ্চিমাঞ্চলে যে মুসলিমরা বাস করে তারা মুখ করবে পূর্ব দিকে আর তার পূর্বাঞ্চলে যারা বাস করে তারা মুখ করবে পশ্চিম দিকে। একইভাবে উত্তরাঞ্চলের লোকেরা দক্ষিণ দিকে আর দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা উত্তর দিকে।

খ. পৃথিবী গোলকের কেন্দ্রবিন্দু কা’বা মুসলিমরাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র আঁকেছিল। তাদের চিত্রে দক্ষিণ ছিল ওপর দিকে আর উত্তর ছিল নিচের দিকে। তখন কা’বা ছিল কেন্দ্র বিন্দুতে।

পরবর্তিকালে পশ্চিমা মানচিত্রকররা পৃথিবীর যে মানচিত্র আঁকলো তাতে ওপর দিকটা নিচে আর নিচের দিকটা ওপরে অর্থাৎ উত্তর হলো ওপরের দিকে আর দক্ষিণ হলো নিচের দিকে। আলহামদুলিল্লাহ এ ক্ষেত্রেও “কাবাই মানচিত্রের কেন্দ্রবিন্দু থেকে গেল”।

গ. কা’বাকে ঘিরে তওয়াফ করা আল্লাহর একত্বের নির্দেশক মুসলিমরা কা’বা যেয়ারতে মক্কায় গেলে ‘তওয়াফ’ করে।

অর্থাৎ কা’বা ঘরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। কাজটি এক আল্লাহ বিশ্বাস ও উপাসনার নিদর্শন। প্রতিটি বৃত্ত গোলাকার এবং তার একটিই কেন্দ্র বিন্দু থাকে। কাজেই উপাসনার যোগ্য আল্লাহ-মাত্র একজনই, এটা তারই অন্যতম নিদর্শন।

ঘ. হযরত উমর রাঃ এর হাদীস হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর সম্পর্কিত হযরত উমর রাঃ এর একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে। হাদীসে শাস্ত্র অনুযায়ী যাকে ‘আছার’ বা ঐতিহ্য বলা যায়। বুখারী শরীফের হজ্জ সম্পর্কিত ৩৫৬ অধ্যায়ে ৬৭৫ নং হাদীসে, উমর রাঃ বলেছেন-

“আমি জানি তুমি একটি পাথরখন্ড মাত্র এবং না কোনো উপকার করতে সক্ষম না কোনো ক্ষতি। আমি যদি না দেখতাম খোদ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তোমাকে স্পর্শ করেছেন তা হলে কস্মিন কালেও আমি তোমাকে স্পর্শ করতাম না।”

ঙ. মানুষ কা’বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সময়ে লোকেরা কা’বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিত। মুসলিমরা কা’বা ঘরের উপাসনা করে বলে যারা মনে করেন তাদেরকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কোন মূর্তি-পূজারী, যে মূর্তি সে পূজা করে, তার মাথার ওপরে উঠে দাঁড়ায়? ^{৫৬}

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

৫. সুষ্টিকর্তা ভুল করেছেন ও পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন?

প্রশ্ন: -মুসলিমগণ কুরআনের আয়াত রহিতকরন বিশ্বাস করেন তার মানে- সুষ্টিকর্তা ভুল করেছেন ও পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্

আল্লাহ বলেন -

“আমি কোন আয়াত বা প্রকাশ রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।” সূরা বাকারা-২, আয়াত-১০৬
আয়াতের অর্থ নিদর্শন এবং প্রকাশ। এই আয়াত দুভাবে বিশ্লেষণ করা যায়-

১) প্রকাশ রহিত করা মানে পূর্ববর্তী যেসব কিতাব এসেছিল যেমন তাওরাত, যবুর ,ইঞ্জিল ইত্যাদিও চাইতেও তিনি উত্তম প্রকাশ অবতীর্ণ করি।

২) একে কুরানের আয়াত হিসাবে নিলে বোঝা যায় কোন আয়াত আল্লাহ রহিত করে এর পরিবর্তে তদপেক্ষা উত্তম আয়াত অবতীর্ণ করেন। দুটোই সঠিক।

দ্বিতীয় বিশ্লেষণকে অনেক অমুসলিমগন ভুল বোঝেন-

অনেকে মনে করেন অন্য আয়াতের সাথে এই আয়াতের গরমিল আছে। আল্লাহপাক বলেন কুরআনে -

“তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।” সূরা হুদ আয়াত-১৩

তারা এ দশ আয়াত রচনা করতে অপরাগতা প্রকাশ করলো। তারপর তিনি বলেন যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে তবে একটি-

”মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।”

এরপর তিনি ফাইনাল চ্যালেঞ্জ দেন এরমতো কাছাকাছি (মিমমিছলিহি) একটি সূরা নিয়ে এস-

”এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।”

তারমানে এটার মধ্যে মতদৈততা নেই-

মতদৈততা হলো দুটো ব্যাপার যেখানে একসাথে ঘটা সম্ভব নয়। যেমন আমি বললাম সে ক্লাস ১০ পাশ করতে পারবেনা এরপর আমি বললাম তুমি এমনকি ৫ম শ্রেণী পাশ

করতে পারবেনা এরপর আমি বললাম তোমার ব্রেন এত খারাপ তুমি কেজি পাশ করতে পারবেনা। আমার উপরোক্ত বর্ণনা চারটাই সত্যি ও কোন ভিন্নমত নেই।

মদের ব্যপারেও তিন স্তরে নিষিদ্ধতা এসেছে। একই সাথে নিষেধ হয়নি। যেমন আমি বললাম আমি বরিশালে থাকিনা এরপর বললাম আমি ঢাকায় থাকিনা এরপর বললাম জামালপুর থাকিনা আমার এই তিন বক্তব্য কোন মতদৈততা নেই উপরন্তু তথ্যবহুল।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।⁵⁶

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

৬. কেনো কাফেরদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়?

প্রশ্ন :- যদি আল্লাহ কাফেরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তবে তাদের কেন দোষী সাব্যস্ত করা হয়?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ বলেন –

“আল্লাহ্ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।” সূরা বাকার-২, আয়াত-৭

অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ভবিষ্যৎবানী-

আল্লাহ কাফেরদের হটকারিতার জন্য এই উক্তি করেছেন। তাদের কর্মের জন্য এমন দশা হয়েছে। তারমানে এই নয় যে তাদের কর্মফলের জন্য আল্লাহ দোষী। অপরাধী তারা নিজেই উদাহরন স্বরূপ একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ভবিষ্যৎবানী করলেন কিছু ছাত্র ফেল করবে যেহেতু তারা সঠিক মতো লেখাপড়া ও রুটিন অনুসরণ করেনি।

যদি ছাত্রগুলো ফেল করে আপনি কাকে দোষ দেবেন ছাত্রকে নাকি শিক্ষককে? দোষ ছাত্রই একইভাবে আল্লাহ তাদের অন্তরে সিল মেরে দিয়েছেন কারন তারা ছিল অবাধ্য এই অবাধ্যতার দরুন তারা বিপথে চলে গেছে।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

৭. আল্লাহকে প্রশংসা করা কি প্রয়োজন

প্রশ্ন :-আল্লাহকে প্রশংসা করা কি প্রয়োজন? না করলে তিনি কেন আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তবে তিনি কি করে রহিম হলেন?উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ অল-রেডিই মহান-

ধরুন কেউ বললো আল্লাহ আকবার বা আল্লাহ মহান তার মানে এই নয় আল্লাহ তার প্রশংসার কারনে আরো মহান হয়ে গেলেন আল্লাহ অলরেডিই মহান যতই তাকে প্রশংসা করা হোক বা না হোক তিনি মহামহিম আছেন ছিলেন ও থাকবেন। আপনি তাঁর সমুদয় লাভের জন্য প্রশংসা করছেন না। আল্লাহ বলেন –

“হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ গলগ্রহ। আর আল্লাহ; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।” সূরা ফাতির-৩৫, আয়াত-১৫

তাঁর প্রশংসা করা প্রয়োজন আমাদের লাভের জন্য-

আল্লাহ সমস্ত চাওয়া-পাওয়া থেকে মুক্ত। তাঁর প্রশংসা করা প্রয়োজন আমাদের লাভের জন্য। আপনি এমন কারো সম্মান করবেন যে সর্বজ্ঞ, অত্যন্ত সুক্ষদর্শী ও সব কিছু যার আয়ত্ত্বাধীন, তাঁর প্রশংসা করে আপনি নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন। এজন্যই প্রত্যেক মুসলিম প্রতি নামাযের শুরুই করে তাকে মর্যাদাসূচক উক্তি করে।

আপনি আল্লাহর প্রশংসা যতই করেন তা শেষ হবার নয়-

মুসলিমগণ তার প্রশংসা করে নিজেকে পরিতুষ্ট করেন যে তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও পরিত্রানকারী। ধরুন আপনি হার্টের রোগি, আপনার অসুস্থতার উপশমের জন্য আপনি কি রাস্তার যে কারো থেকে উপদেশ নিবেন নাকি যে হার্টের উপর খুব বিখ্যাত স্পেশালিষ্ট তার কাছ থেকে নিবেন আপাত দৃষ্টিতে তার কাছ থেকেই উপদেশ নিবেন যিনি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

অতএব আল্লাহর প্রশংসা আমাদের নিজেদের উপকার ও স্বার্থের জন্য। আপনি যতই আল্লাহর প্রশংসা করেন তা শেষ হবার নয় কারন আল্লাহ বলেন-

“হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না। ” সূরা কাহাফ-১৮, আয়াত-১০৯

আরও বলা হয়েছে -

“পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়) , তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তবুও আল্লাহর কথা (লেখা) শেষ হবে না। অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। সূরা লুকমান-৩১, আয়াত-২৭

আল্লাহ আপনার ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। আপনি যতই প্রশংসা করেন তা শেষ হবে না। এবং তা করবেন আপনার জন্য।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।^{১৬}

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন - উত্তর পর্ব সমগ্র

৮.ইসলাম কি বহু খোদায় বিশ্বাস করে ?

প্রশ্ন : ইসলাম কি বহু খোদায় বিশ্বাস করে কারন অনেক স্থানে আমি-র পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

বহু ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে-

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনে আমরা শব্দটি ব্যবহার করেছেন তারমানে এই নয় তিনি বহু। ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে একটি হল পরিমান বোঝাতে আরেকটি হল সম্মানার্থে।

ইংরেজিতে ইংল্যান্ডের রানীকে আমরা বলে সম্মানার্থে সম্বোধন করা হয়। যা রাজকীয় মর্যাদা। ইন্ডিয়াতেও রাজিব গান্ধি বলেন-'হাম দেখনা চাতেহে' এখানে হাম মানে আমরা এটি সম্মানার্থে ব্যবহার হয়েছে। একইভাবে আরবীতে 'নাহনু' শব্দটি মর্যাদা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী-

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :-

“কুল হুয়াল্লাহু আহাদ” অর্থাৎ তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সূরা ইখলাস-১১২, আয়াত-১ ⁵⁶

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

৯.ইসলাম কেন মুসলিমদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?

প্রশ্নঃ - বিজ্ঞান আমাদের বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলিমদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

ক. পশুর মধ্যে শুধু ত্বনভোজী পশু খাওয়া অনুমোদিত

এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, ব্যক্তি যা আহাৰ করে তার প্রতিক্রিয়া তার আচরণে প্রকাশ পায়। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদি হিংস্র মাংসাশী প্রাণী খাওয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে- এটা তার অন্যতম একটি কারণ। এ ধরনের হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। সে কারণে ইসলাম শুধু মাত্র গরু, মহিশ, ছাগল, ভেড়ার মতো শান্ত ও খুব সহজে পোষ্যমানা প্রাণীর মাংস খেতে অনুমতি দেয়। বস্তুত এ কারণেই মুসলিমরা শান্তিকামী-শান্তিপ্রিয়।

খ. জ্যোতির্ময় কুরআন বলছে- যা কিছু মন্দ রাসূল তা নিষিদ্ধ করেছেন-

”রাসূল তাদেরকে ভালো কাজ করতে আদেশ করেন। আর নিষেধ করেন যাবতীয় মন্দ থেকে এবং তিনি তাদের জন্য হালাল করেছেন যা কিছু ভাল, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন। আর হারাম করেছেন যা কিছু মন্দ অপরিচ্ছন্ন অপবিত্র। ” (সূরা আরাফ-৭: ১৫৭)

”রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যে সব থেকে নিষেধ করেন সে সব থেকে বিরত থাকো। ” (সূরা হাশর-৫৯ : ৭)

একজন মুসলিমের জন্য তাদের রাসূলের এই বার্তার যথেষ্ট যে, আল্লাহ চান না মানুষ এমন কোনো ধরনের মাংস খায়- যেখানে অন্য কিছু ধরনকে (শান্ত-শিষ্ট পশুকে আহারের) অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

গ. মাংসাশী প্রাণী খাবার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ)-এর বাণী সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বেশ কিছু সর্বসম্মত শুদ্ধ হাদীসের মধ্যে ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণিত মুলিম শরীফের ‘শিকার ও জবাই’ অধ্যায়ের ৪৭৫ নং হাদীসে, সুনানে ইবনে মাজাহর ১৩ অধ্যায়ের ৩২৩২ থেকে ৩২৩৪ হাদীস সমূহ উল্লেখযোগ্য। রাসূল (ﷺ) খেতে নিষেধ করেছেনঃ

১. তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতওয়ালা হিংস্র জন্তু। অর্থাৎ মাংসাশী বন্য পশু প্রধানত বেড়াল ও কুকুর জাতীয় বাঘ, সিংহ, বেড়াল এবং শেয়াল, কুকুর, নেকড়ে, হায়না ইত্যাদি।

২. তীক্ষ্ণ দন্ডের অন্যান্য প্রাণী যেমন হুঁদুর, ন্যাংটি হুঁদুর, ছুঁচো ও ধারালো নখওয়ালা খরগোশ ইত্যাদি।

৩. সরিশ্রীপ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী যেমন সাপ কুমীর ইত্যাদি।

৪. ধারালো ঠোঁট ও নখওয়ালা শিকারী পাখি যেমন চিল, শুকুন, কাক, পেচাঁ ইত্যাদি।
সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে পারে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক দলিল নেই যে, আমিষ খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ উগ্র ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।^{৫৬}

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

১০. কুরআন কে কিভাবে আল্লাহর আয়াত বলা যায়?

প্রশ্ন :-আল-কুরআন সংকলন করা হয়েছে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে তাহলে তা কিভাবে আল্লাহর আয়াত বলা যায়?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্।

আয়াত বা সূরা নাযিলের পরপর সাহাবাদের মুখস্ত করতে ও লিখে রাখতে নির্দেশ দেয়া হত:-

এটা বলা ভুল যে হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআন সংকলন করেছেন প্রকৃতপক্ষে রাসুল (ﷺ)-এর জীবিতকালে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষিত হয়েছিল। যখন কোন আয়াত রাসুল (ﷺ) এর প্রতি নাযিল হতো তিনি অনতিবিলম্বে তা মুখস্ত করে নিতেন এবং সাহাবাদের শোনাতেন এবং তাদের মুখস্ত করতে ও লিখে রাখতে নির্দেশ দিতেন, এবং তিনি সাহাবাদের পড়িয়ে শোনাতে বলতেন শুদ্ধতা যাচাই করতেন অর্থাৎ সাহাবীদের স্মরণ শক্তি পরীক্ষা করে দেখতেন।

তিনি সাহাবাদের সুরার ধারাবাহিকতা বলে রাখতেন ,যেমন-প্রথম যে সুরা নাযিল হয়েছে সুরা ইকরা যা পবিত্র কুরআনে ৯৬নং সূরা যা তিনি জীবরঈল (আঃ) এর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন । বর্তমানে যে পর্যায় ক্রমিক সূরায় কুরআন সংকলিত আছে তার অনুরূপ ‘লাওহে মাহফুজে’ লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রতি রমজানে রাসুল(ﷺ) জীবরঈল (আঃ) দ্বারা পুনরাবৃত্তি করতেন । তাঁর মৃত্যুকালীন বছরে রমজানের সময় তিনি দুবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন ।

কুরআন একত্রিকরন-

কুরআন সংরক্ষিত হয়েছিল বিভিন্ন আগিকে-গাছের বাকলে,চমড়ায় ,উটের সেডলে ,সমতল পাথরে,গাছের পাতায়। ১ম খলীফা আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফত কালে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু কুরআনে হাফেজ শহীদ হন। হযরত আবু বকর (রাঃ)ও ওমর (রাঃ) সাহা

বীগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যয়িদ-বিন-সাবিদ(রাঃ)-কে কুরআন সংকলনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন। সব সাহাবীদের একসাথে করে যয়িদ-বিন-সাবিদ (রাঃ) সব কুরআনের আয়াতকে একসাথে করেন। এরপর তা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর তত্তাবধানে আসলে তাঁর হাত হতে হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট পৌঁছায়।

হযরত ওসমান (রাঃ) খিলাফতকাল-

তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর সময় ইসলাম যখন প্রসার লাভ করছিল । বিভিন্ন স্থানের মধ্যে উচ্চারণত সমস্যা দেখা দেয়ায় তিনি বিভিন্ন দেশের কুরআন হাফেজ এবং সংকলকদেরকে ডেকে পাঠান

ও হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট হতে সংরক্ষিত কুরআন লিখে রাখতে বলেন ও তা সম্প্রচার করতে বলেন আর বাকী কুরআন তিনি পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন, কারন সব সাহাবীদের পক্ষে সমস্ত কুরআনের আয়াত সংরক্ষিত ছিলনা কারো কাছে ছিল ৫০০ আয়াত বা তার কম বা বেশি। পূর্বের কুরআনে হুবহু তুর্কির ফাভাকি যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে ।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন সূরা হিজর-১৫, আয়াত-৯-

“আমরা কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষনকারী।” ^{৫৬}

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

১১. ইসলামে বহু-বিবাহ অনুমোদিত কেন?

প্রশ্নঃ- ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় কেন? অথবা ইসলামে বহু-বিবাহ অনুমোদিত কেন?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

ক. বহু-বিবাহের সংজ্ঞা ‘বহু-বিবাহ’ মানে এমন একটি বিবাহ পদ্ধতি যেখানে এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে। বহু-বিবাহ দুই ধরনের- একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করে। আর একটি ‘বহু স্বামীবরণ’।

অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোক একাধিক পুরুষ বিবাহ করে। ইসলামে পুরুষের জন্য সীমিত সংখ্যক ‘বহু-বিবাহ’ অনুমোদিত। অপর দিকে নারীর জন্য একাধিক পুরুষ বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ‘হারাম’।

এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। কেন একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি পায়?

খ. পৃথিবীতে কুরআ’নই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ, যে বলে “বিবাহ করো মাত্র একজনকে” ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে কুরআনই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ যা এই বাক্যাংশ ধারণ করে আছে-“বিবাহ করো মাত্র একজনকে” আর কোনো ধর্ম-গ্রন্থ নেই, যা পুরুষকে নির্দেশ একজন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে।

অন্য কোনো ধর্ম-গ্রন্থ -হোক তা বেদ, রামায়ন, মহাভারত, গীতা, অন্যদিকে তালমুদ অথবা বাইবেল। এ সবার মধ্যে স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধ বের করতে পারবে কি কেউ? বরং এসব ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একজন পুরুষ বিবাহ করতে পারে যতজন তার ইচ্ছা।

এটা অনেক পরের কথা যে, হিন্দু ধর্ম গুরু এবং খ্রীস্টান চার্চ স্ত্রীর সংখ্যা ‘এক’ এ নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে।

অসংখ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী রেখেছে। যেমন রামের পিতা রাজা দশরথ। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের তো অনেক স্ত্রী ছিল!

বাইবেল যেহেতু স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধই নেই। সেহেতু আগের কালের খ্রীস্টান পুরুষরা যে-ক’জন খুশি স্ত্রী রাখতে পারত। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে তাহাদের চার্চ স্ত্রীর সংখ্যা ‘এক’ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ইহুদীবাদে বহু বিবাহ অনুমোদিত। তাদের তালমুদীয় বিধান অনুযায়ী আব্রাহামের [ইব্রাহীম (আ)] তিনজন স্ত্রী ছিল এবং সলোমনের [সুলাইমান (আ)]-এর ছিল শতাধিক স্ত্রী।

বহু-বিবাহের এই প্রথা চলে আসছিল তাদের “রাব্বাঈ” জারসম বিন ইয়াহুদাহ্ পর্যন্ত। (৯৬০ সি.ই থেকে ১০৩০ সি.ই) তিনিই এর বিরুদ্ধে একটি অনুশাসন জারি করেন। ইহুদীদের ‘সেফারডিক’ সমাজ যারা প্রধানত মুসলিমদের দেশগুলোতে বসবাস করে তারা এই প্রথাকে নিকট অতীতের ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ধরে রাখে। অতঃপর ইসরাঈলের প্রধান রাব্বাঈ একাধিক স্ত্রী রাখার ওপর বিধিনিষেধ জারি করে দেয়।

একটি লক্ষণীয় বিষয়ঃ ১৯৭৫ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী ভারতীয় হিন্দুরা বহু বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিমদের চাইতে অগ্রগামী।

কমিটি অফ দি স্ট্যাটাস অফ ওমেন ইন ইসলাম (ইসলামে নারীর মর্যাদা কমিটি) নামে এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে। বইয়ের ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ-সংক্রান্ত বিবাহ, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা পাঁচ দশমিক শূন্য ছয় (৫.০৬%) আর মুসলিমদের মধ্যে চার দশমিক তিন এক (৪.৩১%)।

ভারতীয় আইন অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত। ভারতে যেকোনো অমুসলিমের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ। এটা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুরাই একাধিক স্ত্রী বেশি রাখছে।

এর আগে তো কোনো বিধিনিষেধই ছিলনা। এমনকি হিন্দু পুরুষদের ক্ষেত্রেও একাধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদিত ছিল। এই তো সেদিন ১৯৫৮ সালে হিন্দু বিবাহ-বিধি অনুমোদিত হলো এভাবে যে, একজন হিন্দুর জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ।

বর্তমানে এটা একটা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আইন। যা নিয়ন্ত্রিত করেছে একজন হিন্দু পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখতে- “হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ” নয়।

আসুন এবার দেখা যাক ইসলাম কেন একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়।

গ. কুরআন একাধিক বিবাহের নিয়ন্ত্রিত রূপকে অনুমতি দেয় আমি আগে যেমন বলে এসেছি ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে কুরআনই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যা বলে ‘বিবাহ করো মাত্র একজনকে’। কথাটি জ্যোতির্ময় কুরআনের সূরা নিসার নিম্নদ্বিতীয় আয়াতের অংশ-

”বিবাহ করো তোমাদের পছন্দের নারী- দু’জন অথবা তিনজন অথবা চারজন কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তোমরা (তাদের সাথে) ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে না-ও পারতে পারো- তাহলে মাত্র একজন। ” (৪:৩)

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বহু-বিবাহের কোনো মাত্রা নির্ধারিত ছিল না এবং ক্ষমতাবান প্রায় প্রতিটি মানুষ এতে অভ্যস্ত ছিল। কেউ কেউ তো শ’ এর মাত্রা ছাড়াই ক্ষান্ত হতো না।

কুরআন সর্বোচ্চ চার জনের একটা মাত্রা নির্ধারণ করে দিল। ইসলাম একজন পুরুষকে দুজন, তিনজন অথবা চারজনের যে অনুমতি দিয়েছে তা কঠিন শর্তের মধ্যে আবদ্ধ যে, কেবলমাত্র তখনই তা সম্ভব যখন তাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচারমূলক আচরণ করতে পারবে।

একই সূরার ১২৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

“তুমি কখনিকালেও পেরে উঠবে না স্ত্রীদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে। ” (৪:১২৯)

কাজেই ইসলামে বহু-বিবাহ কোনো বিধান নয় বরং ব্যতিক্রম। বহু মানুষ এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত যে, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা বাধ্যতামূলক। করা এবং না করার ক্ষেত্রে ইসলামের পাঁচটি শ্রেণী-বিন্যাস করা আছে।

১. ফরজ-অবশ্য করণীয় বা বাধ্যতামূলক। ২. মুস্তাহাব-অনুমোদিত অথবা উৎসাহিত। ৩. মুবাহ-অনুমোদন যোগ্য বা গ্রহণ যোগ্য। ৪. মাকরুহ- অনুমোদিত নয় বা নিরুৎসাহিত। ৫. হারাম- বে-আইনী বা নিষিদ্ধ।

এর মধ্যে বহু-বিবাহ মধ্যম শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ অনুমোদন যোগ্য এবং কোনো ভাবে এমন কথা বলা যাবে না যে, একজন মুসলিম, যার দুজন, তিনজন অথবা চারজন স্ত্রী আছে, সে তার তুলনায় ভালো মুসলিম যার স্ত্রী মাত্র একজন।

ঘ. গড় আয়ুষ্কাল পুরুষের তুলনায় নারীর বেশি প্রাকৃতিকভাবে নারী ও পুরুষের জন্মহার প্রায় সমান। একটি নারী শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরুষ শিশুর চাইতে বেশী।

একটি নারী শিশু রোগ-জীবানু ও রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে পুরুষ শিশুর চাইতে লড়াই করতে পারে। এ কারণে শিশুকালে নারীর তুলনায় পুরুষের মৃত্যু হার বেশি।

যে কোনো যুদ্ধের সময় নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়। সাধারণ দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যাধিতে নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়।

গড় আয়ুষ্কাল পুরুষের চাইতে নারীর বেশি। মহাকালে যে কোনো যুগে খুঁজে দেখলে দেখা যাবে-বিপত্তীকের চাইতে বিধবার পরিমাণ অনেক বেশি।

ঙ. ভারতে পুরুষের জন্ম-সংখ্যা নারীর তুলনায় বেশি। এর কারণ নারী শিশুর ভ্রূণ-হত্যা ও নারী শিশু হত্যা। প্রতিবেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে ভারতীয় পুরুষ-জনসংখ্যা নারী-জন সংখ্যার চাইতে বেশি।

এর নেপথ্য কারণ, নারী শিশু হত্যার উচ্চ হার। প্রতি বছর নুন্যতম দশলাখ ‘নারী-জ্ঞানের’ গর্ভপাত ঘটানো হয় এই দেশে যখনই মায়ের গর্ভে তাকে নারী হিসাবে সনাক্ত

করা যায়। যদি এই অভিশপ্ত চর্চা বন্ধ করা যায় তাহলে ভারতেও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে।

চ. বিশ্বব্যাপী নারী জনসংখ্যা পুরুষের চাইতে অধিক আমেরিকায় পুরুষের চাইতে সত্তর লক্ষ আশি হাজার নারী বেশি।

✓ শুধু নিউইয়র্কে পুরুষের চেয়ে দশলাখ নারী।

✓ উপরন্তু নিউইয়র্কের এক তৃতীয়াংশ পুরুষ সমকামী। অর্থাৎ এই লোকেরা কোনো নারী-সঙ্গ বা বিবাহ করতে আদৌ আগ্রহী নয়।

✓ ইংল্যান্ডে পুরুষ জনসংখ্যার সমসংখ্যক নারী বাদ দিলে চল্লিশ লক্ষ অতিরিক্ত নারী।

✓ একই ভাবে জার্মানিতে পঞ্চাশ লাখ অতিরিক্ত নারী।

✓ রাশিয়ায় নব্বুই লাখ।

এরপর শুধু আল্লাহই বলতে পারেন গোটা পৃথিবীতে একজন পুরুষের বিপরীতে একজন নারী ধরে নিলে তারপর কত নারী অতিরিক্ত থেকে যাবে।

ছ. প্রতিটি পুরুষের জন্য মাত্র একজন স্ত্রী এই নিয়ন্ত্রণ বাস্তবতা বিবর্জিত আমেরিকার প্রতিটি পুরুষ যদি একজন করে নারীকে বিবাহ করে তারপরেও তিন কোটির বেশি নারী থেকে যাবে এমন, যারা তার জন্য কোনো স্বামী পাবে না।

উপরন্তু মনে রাখতে হবে, সারা আমেরিকায় সমকামী পুরুষের সংখ্যা দুই কোটি পঞ্চাশ লাখের বেশী। এভাবে চল্লিশ লাখের বেশি নারী ইংল্যান্ডে। পঞ্চাশ লাখের বেশি জার্মানিতে এবং প্রায় এক কোটি নারী রাশিয়ায়- যারা কোনো স্বামী পাবে না।

ধরা যাক, আমার বোন আমেরিকা নিবাসী একজন অবিবাহিতা মহিলা অথবা আপনার বোন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন অবিবাহিতা নারী।

সেখানে তার জন্য দুটি বিকল্প পথ খোলা আছে- হয় সে এমন একজন পুরুষকে বিবাহ করবে যার একজন স্ত্রী আছে অথবা তাকে হতে হবে “জনগণের সম্পত্তি”-অন্য কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে যারা রুচিশীলা তারা প্রথমটাই বেছে নেবে।

অধিকাংশ নারী অন্য নারীর সাথে তার স্বামীকে ভাগাভাগি করতে রাজি হবে না। কিন্তু ইসলামে পরিস্থিতি বিবেচনায় তা-ই অপরিহার্য হয়ে ওঠে-“মুসলিম নারী তার যথার্থ ঈমানের কারণে এই সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে অনেক বড় ক্ষতি ঠেকাতে তার আর এক মুসলিম বোনকে জনগণের সম্পত্তি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন”।

জ. জনগণের সম্পত্তি হওয়ার চাইতে একজন বিবাহিতা পুরুষ বিয়ে করা শ্রেয় পশ্চিমা সমাজের একজন পুরুষের ‘মেয়ে-বন্ধু’ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অথবা একাধিক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক।

এক্ষেত্রে নারীরা যাপন করে মর্যাদাহীন এক অনিশ্চিত-অরক্ষিত জীবন। অথচ সেই একই সমাজ একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে রাজি নয়। যেখানে নারী হতে পারতো একজন সম্মানিতা, মর্যাদাময় অবস্থানের অধিকারিণী এবং যাপন করতো নিরাপত্তাপূর্ণ নিরাপদ জীবন।

যেখানে নারীর সামনে দুটি পথ খোলা। যে স্বাভাবিকভাবে কোনো স্বামী পাবেনা তাকে হয় একজন বিবাহিত পুরুষকেই বিয়ে করতে হবে নতুবা হতে হবে জনগণের সম্পত্তি।

ইসলাম পছন্দ করে নারীকে সম্মানজনক অবস্থান দিতে, প্রথম পথের অনুমোদন দিয়ে এবং ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে দ্বিতীয়টিকে। আরো একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে সব পুরুষের একাধিক স্ত্রী রাখার অর্থনৈতিক বা অনেকের দৈহিক সামর্থ্য থাকেনা।

আরো কিছু রয়েছে যে সবার জন্য ইসলাম নিয়ন্ত্রিত বহু-বিবাহ অনুমোদন করে। কিন্তু প্রধানত নারীর সম্মান-মর্যাদা ও সম্মম সুরক্ষাই লক্ষ্য।⁵⁶

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

১২.সকল ধর্ম একই?

প্রশ্ন : যদি সকল ধর্মই এক সৃষ্টিকর্তার ধারণা প্রকাশ করে তার মানে এই নয় যে - সকল ধর্ম একই?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

” সবধর্মই এক”- এক অর্থহীন প্রলাপ-

পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিগন বা সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদগন একই মঞ্চে দাড়িয়ে উক্তি করেন-” সবধর্মই এক” । এসব অর্থহীন প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আপনি যদি উক্ত হিন্দু ব্যক্তিকে বলেন মুসলিম হতে বা মুসলিম ব্যক্তিকে বলেন খ্রীষ্টান হতে তারা কি নিজের ধর্ম পরিহার করবেন? উত্তর-না। তাহলে সবধর্ম কি করে একই হয়? এসব ব্যক্তিগন ধর্মকে ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধিতে পটু।

২+২=কত ?

ব্যাপারটা এমনই যে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করা হল ২+২=কত? কেউ বললো ৪ কেই ৫ আবার কেউ বললো ৬। তিনজন শিক্ষক মঞ্চে উঠে বললেন তিনটা উত্তরই সঠিক।

আমাদের পরস্পরের মিলগুলো অনুসরণ করি-

অমিল রয়েছে অনেক সেটা ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃঃ ও সৌহার্দের নিদর্শন স্থাপন করার লক্ষ্যে এই সুত্রটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি - ধরুন আমরা বাইবেল, কুরআন, বেদ সব একসাথে করি তারপর সবগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যতা নিরূপন করি,প্রত্যেকটির মধ্য হতে মিলগুলো আমরা একসাথে আনয়ন করি এবং সেটা অনুসরণ করি। । আল্লাহপাক আমাদের শিক্ষা দেন -

“ বলো- হে গ্রন্থপ্রাপ্ত লোকেরা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে পরস্পর সমঝোতার সাথে এসো যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত করবোনা আর আমরা আল্লাহ

ছাড়া অন্য কাউকে মনিব বলে স্বীকার করবোনা। কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় তবে বলো-সাক্ষী থেকে আমরা কিন্তু মুসলিম।” সুরা ইমরান-৩, আয়াত-৬৪

মোহাম্মদ (ﷺ) ইসলাম ধর্ম নিয়ে এসেছেন?-

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা বিশেষ করে অমুসলিমগণের এমনকি মুসলিমদের মধ্যেও যে হযরত মোহাম্মদ (ﷺ) ইসলাম ধর্ম নিয়ে এসেছেন ১৪০০ বছর পূর্বে। ইসলাম তখনই এসেছে যখন মানুষ সর্বপ্রথম পৃথিবীতে পর্দাপন করেছে। এক সৃষ্টিকর্তা হতে যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তথা স্থানে নবী বা বার্তাবাহক এসেছেন যেমন:- আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ), মুসা(আঃ) এবং সর্বশেষ বার্তাবাহক হযরত মোহাম্মদ (ﷺ)। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে -

“আর এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার মধ্যে একজন সতর্ককারী না গেছেন।” সুরা ফাতির-৩৫, আয়াত-২৪

কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। চারজন নবীর উপর আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) -এর উপর তাওরাত, দাউদ (আঃ)-যবুর, ঈসা (আঃ)ইঞ্জিল এবং কুরআন-হযরত মোহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর।

ইঞ্জিল=বাইবেলে?

বর্তমানে খ্রীষ্টানগণ ইঞ্জিল কিতাব যেটাকে বাইবেল বলেন, সেটা সেই ইঞ্জিল বা বাইবেল নয় যা মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন। বর্তমান বাইবেলে বিভিন্ন রং-বেরঙ্গের মতবাদে পরিপূর্ণ। আপনি বাইবেল পড়লে সেখানে

- ✓ ঐতিহাসিকদের মন্তব্য দেখতে পাবেন
- ✓ ছবি দেখতে পাবেন ,
- ✓ কিছু তথাকথিত নবীর বাণী দেখতে পাবেন,

✓ সৃষ্টিকর্তার হতে নিয়ম কানুন দেখবেন

✓ এমনকি মা-ছেলে অশালীন সম্পর্ক ও বাবা-মেয়ের সাথে কুরুচিপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা ও পরিলক্ষিত হবে

World Top update version-বাইবেল নাম্বার ১-

এসব ধর্মগ্রন্থে আছে ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। বাইবেল পুরোপুরি সৃষ্টিকর্তার শব্দ বা আয়াত নয়। প্রতিবছরই কিছু খ্রীষ্টান স্কলারগন নিজের ইচ্ছামত শব্দ বা আয়াত সংযোজন বা বিয়োজন বা বাতিল করেন সামনের বছরের জন্য নতুন তথ্য পরিবেশন করেন (বাইবেলের মোড়কে) নিজেদের সুবিধার্থে যা Software update version এর মতো। যেমন আপনার কাছে ২০১২ সালের KJB (King James bible) আছে কিন্তু ২০১৩ সালে সেটা হতে সংযোজন ও বিয়োজন করে update ২০১৩ KJB বিক্রয় করা হবে। এটা স্রেফ নেহাতই এক রমরমা ব্যবসা। আশ্চর্যের ব্যপার এই যে দেদারসে লোকজন update version কিনছে এবং সব মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচারিত হচ্ছে এ বছর update version-এ কত মুনাফা হয়েছে! আমার মনে হয় পৃথিবীতে যদি Top update পরিসংখ্যান হয় নিঃসন্দেহে বাইবেল স্থান হবে নাম্বার-১।

নবীগন এসেছিলেন নির্দিষ্ট জাতির ও নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত-

এছাড়াও বিভিন্ন নবী যে বানী নিয়ে এসেছিলেন মানুষের কাছে তা বিকৃত হয়ে গেছে। নবীগন এসেছিলেন শুধু তাদের নির্দিষ্ট জাতির জন্য এবং নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত। সুরা সাফ-৬১, আয়াত-৬ এ আল্লাহ বলেন -

“ঈসা (আঃ)-কে শুধু বনী ইসরাঈল গোত্রের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।”

বাইবেলে বর্ণিত আছে -

“ইহুদীগন ব্যতিত অন্য কারো কাছে যাবেনা” Gospel of mathew -10 ,verse 5-

বাইবেলে বর্ণিত আছে -

“আমি শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত হয়েছি ।” Gospel of mathew -15,verse-

24

কিন্তু ইসলাম শুধু কোন গোত্র বা নির্দিষ্ট সংখ্যক জাতির প্রতি আসেনি। আল্লাহ বলেন-

“আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সমস্ত মানবজাতির রহমত সরূপ ।” সূরা আশ্বিয়া-২১,
আয়াত-১০৭

আপনাকে অনুসরণ করতে হবে সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন-

হিন্দুধর্ম গ্রন্থ অথবা অন্য ধর্মগ্রন্থ হতে পারে সৃষ্টিকর্তা হতে আগত কিন্তু তা এসেছে
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট জাতিকে ভিত্তি করে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর
বলেন-

“ ১২০০বছর ধরে একমাত্র কুরআনই নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে।

তা তিনি বলেছেন আরও ২০০ বছর পূর্বে। এখনো কুরআন অবিকৃত রয়েছে। যদিও
অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টিকর্তা হতে আগত হয়ে থাকে আপনাকে অনুসরণ করতে হবে
সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন। ঈসা (আঃ), মুসা (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ) ছিলেন মুসলিম
। তারা শান্তির বানী ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন কালের আবর্তে মানুষ তা বিকৃত
করেছে। ইসলামকেই অনুসরণ করতে হবে ,অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ নয় যা মানুষের
তৈরি, আল্লাহ বলেন -সূরা আল -ইমরান -৩, আয়াত-৮৫-

“আর যে কেউ ইসলাম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম অনুসরণ করে তাহলে তার কাছ
থেকে কখনো তা কবুল করা হবেনা। আর আখেরে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।”

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

১৩. কেন আল্লাহ খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং ইহুদি বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠান?

প্রশ্ন :ইসলামই যদি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হয় তবে কেন আল্লাহ খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং ইহুদি বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠান?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

রাসূল (ﷺ) বলেন-

“প্রত্যেক শিশুই মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করে” –

মুসলিম অর্থ নিজের ইচ্ছা বা আকাংখা আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দেয়া। সে বড় হবার পর মা-বাবা বা তার অভিভাবকের ধর্ম অনুসরণ করে। সে হয়তো আগুনের পূজা করে, পাথরের পূজা করে, মূর্তির পূজা করে। যদি কোন শিশু হিন্দু ঘরে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যু বরন করে তবে সে স্বর্গবাসী হবে কারন সে নিরাপরাধ। কিন্তু পরবর্তীতে সে বেড়ে ওঠার পর যখন সে জানতে ও বুঝতে শিখে এরপরও যদি সে ভ্রান্ত ধারণায নিমজ্জিত থাকে তবে তার ভুলের সমূহ মাশুল তাকেই বহন করতে হবে।

কুরআনের দিকেই ফিরে আসতে হবে-

যদিও হিন্দু ধর্ম অনেকাংশে মানুষের দ্বারা বিকৃত হয়েছে তবুও সেখানে উল্লেখ রয়েছে অন্তিম ঋষি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নাম। খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে তিনি পথপ্রদর্শক হয়ে আসবেন এবং তাঁকে পবিত্র কুরআন দেয়া হবে। হিন্দুধর্মগ্রন্থ, খ্রীষ্টানধর্মগ্রন্থ বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ যাই পড়েন আপনাকে কুরআনের দিকেই ফিরে আসতে হবে। প্রত্যেকেই নিজের জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চিন্তা ভাবনা করা উচিত সঠিক পথ কোনটি। আল্লাহ বলেন সূরা ফুসিলাত-৪১, আয়াত-৫৩-

“ আমরা অচিরেই তাদের দেখবো আমার নির্দেশ বানী দিগন্তে এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যেও; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে সম্পষ্ট হয়ে যায় এটা ধ্রুবসত্য নিঃসন্দেহে।”

সৃষ্টিকর্তা একত্ববাদের বার্তা পৌঁছে দিবেনই-

অতএব আল্লাহ প্রত্যেককেই সত্যের আলোক শিখায় পথ দেখাবেন কিন্তু সত্য অনুধাবন করার পরও সে যদি ভাবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করি আমি অসৎ হতে পারবোনা, মিথ্যা বলতে পারবোনা, মদ-গাঁজা খেতে পারবোনা, জুয়া খেলা যাবোনা, রাস্তাঘাটে মহিলাদের উত্তক্ত করার সুযোগ পাওয়া যাবে না আমাকে ইসলামী পোষাক পড়তে হবে, এসব ভেবে যদি সে পিছু হটে যায় তাহলে তার দায়িত্ব বহন করতে হবে ভবিষ্যৎ পরিনতির জন্য। সৃষ্টিকর্তা আপনার নিকট যেকোন না কোন ভাবে তার একত্ববাদের বার্তা পৌঁছে দিবেনই পবিএ কুরআনে এটা তার চ্যালেঞ্জ সত্য আপনার সামনে তিনি উন্মোচিত করবেন এরপরও আপনার দায়-দায়িত্ব আপনার যুক্তিকতার মাধ্যমে বাছ-বিচার করে মিথ্যাকে ছুড়ে ফেলে যেকোন মূল্যে সত্যকে আকড়ে ধরার বাধ্য-বাধকতা আপনার।

যেদিন প্রতিটি মানুষের কর্মের হিসাব নেয়া হবে তখন আপনি এই অনুযোগ সৃষ্টিকর্তার নিকট করতে পারবেননা আপনি সত্যের সন্ধান পাননি। আজ আপনি যদি ইসলাম গ্রহন করেন পূর্বের সমস্ত পাপ আপনার ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং আপনার সৎ কর্মের পুরস্কার দেয়া হবে দ্বিগুন অন্যান্য মুসলিমদের চাইতে।

প্রতিটি মুসলিমদের উচিত অমুসলিমগণের নিকট ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেয়া-

ইসলাম জোর- জবরদস্তিতে বিশ্বাসী নয়। আপনার কাজ বার্তা পৌঁছে দেয়া, আল্লাহ বলেন-

“ তোমার কাজ বার্তা পৌঁছে দেয়া।” সুরা গাশিয়া -৮৮, আয়াত -২১,২২

আপনার কর্মের জন্য দায়ী হতে হবে আপনাকেই-

যখনই আপনি বার্তার সত্যতা বুঝতে পারবেন আপনার ইসলামের ছায়াতলে আসতে হবে আর যদি না আসেন আপনার কর্মের জন্য দায়ী হতে হবে আপনাকেই। একই

ভাবে অনেকে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু কর্মে এবং চিন্তায় তারা মুসলিম নয় তারা নামে মাত্র মুসলিম , তারা বেহেশতে যাবেনা। এটা ভুল ধারণা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, নাম মোহাম্মদ, কাদের, মানিক, হলেই সে স্বর্গে যাবে, অনেকেই বলে কলেমা পড়লেই বেহেশতে প্রবেশ করবে ,কলেমা পড়ে তার মর্ম অনুযায়ী কাজ করা না হয় তবে তা নিরর্থক । এমনকি মদিনার মুনাফিকরা কলেমা পড়েছিল তারা কি বেহেশতে প্রবেশ করবে? কখনই না। ⁵⁶

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

১৪.ইসলাম একটি বর্বর ধর্ম?

প্রশ্ন:-ইসলাম একটি বর্বর ধর্ম কারন কুরআনে বলা হয়েছে যেখানে কাফের পাও হত্যা কর?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামকে নিন্দা করার অন্যতম পদ্ধতি হলো কুরআনের আয়াতকে পূর্বসূত্র হতে সরিয়ে উপস্থাপন করা। অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে সবচাইতে যে আয়াতটির অপব্যবহার করা হয় তা হলো সূরা তওবা-৯, আয়াত-৫-

“যেখানেই কাফেরদের খুঁজে পাবে হত্যা কর।” সূরা তওবা-৯, আয়াত-৫

আয়াতটি প্রসঙ্গ ও পূর্বসূত্রতার বহিভূত-

এবং আপনি যদি পবিত্র কুরআন খুলে দেখেন সে আয়াতটি দেখতে পাবেন। কিন্তু আয়াতটি প্রসঙ্গ ও পূর্বসূত্রতার বহিভূত। মিডিয়া কুরআনের আয়াতকে অপ্রাসঙ্গিকরূপে সাধারণ মুসলিম ও অমুসলিমগণের নিকট উত্থাপন করেছে। এই আয়াতখানি নাযিল হয়েছে মুসলিম ও মক্কার মুসলিমদেও চুক্তির উপর ভিত্তি করে এবং এই শান্তি চুক্তিটি অমুসলিমগণ অযাচিতভাবে ভঙ্গ করে। তাই আল্লাহ অমুসলিমদের সতর্ক সংকেত দিয়ে বলছেন ৪ মাসের মধ্যে শান্তিচুক্তি সঠিক করতে অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে এবং

যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ মুসলিমদের উৎসাহিত করছেন ভয় পাবেনা যেখানেই শত্রুকে দেখবে হত্যা করবে। এটা অতি সাধারণ যে কোন সেনা প্রধান সৈন্যদের উদ্দীপিত করা জন্য অবশ্যই বলবেন যেখানেই শত্রু পাবে হত্যা করবে, সেতো আর নিজের সৈন্যকে বলবেনা-‘ যেখানে শত্রু খুজে পাও অস্ত্র ফেলে দিয়ে খুন হও’। উদাহরন স্বরূপ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন হানাদার পাকিস্তানীদের সাথে লড়াইছিল তখন প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে কমান্ডারগন অনুপ্রানিত করছিলেন ‘যেখানেই পাকিস্তানী বর্বরদের পাও হত্যা কর’ দেশ স্বাধীনের জন্য পাকিস্তানীদের অত্যাচারী, চরিত্রহীন পাষন্ডদের হামলার জবাব দেয়া জন্য প্রতিটি আর্মি জেনারেল এই উক্তিটি করবেন। কিন্তু এখন যুদ্ধ নেই ২০০৯ সালে কেউ যদি কোন সেনাপ্রধান বলেন-‘পাকিস্তানী হত্যা কর’ তবে তা হবে অপরাধ ও পূর্বসূত্রের বাইরে। অতএব আয়াতটির প্রাসঙ্গিকতা হলো যুদ্ধের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

কউরপস্থি অমুসলিম লেখক অরুনসূরি-

ইসলামের বিরুদ্ধে কউরপস্থি অমুসলিম লেখক অরুনসূরি ‘ফতওয়া’ নামক বইতে এই আয়াতটির অপব্যখ্যা দিয়েছেন, তিনি সুরা তওবার ৫ নং আয়াত হতে ৭ নং আয়াতে long jump দিয়ে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেন? কারন ৬ নং আয়াতে তার সমস্যা সমাধান আছে তা হলো-

“আর যদি মুশরিকদের কোন একজন তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও, যেন সে আল্লাহর বানী শোনে তারপর তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌছে দিয়ো।”

শান্তিই শ্রেষ্ঠতর-

বর্তমানে পৃথিবীর সদয়পূর্ণ সেনাপ্রধান হয়তো বলতে পারেন শত্রুকে ছেড়ে দাও বা যেতে দাও। কুরআন বলছে যদি শত্রুরা শান্তি চায় তবে যুদ্ধ করো অধিকন্তু তাদের এমন স্থানে পৌছে দাও যেখানে তারা নিরাপদ বোধ করে ও আল্লাহর বানী অনুধাবন করতে পারে। আপনি কুআনের আয়াত পড়বেন যা যুদ্ধ সমন্ধে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে, জালিমের বিরুদ্ধে, নির্মম-পাশবিকতার বিরুদ্ধে বেশিরভাগ আয়াতের শেষে

আল্লাহপাক উল্লেখ করেছেন ‘শান্তিই শ্রেষ্ঠতর’ কারন ইসলাম শান্তির ধর্ম। অকারনে কারো রক্তপাত বা যুদ্ধের আহবান সেটি অমুসলিমদের বিরুদ্ধে হোক ইসলাম তা কখনোই সমর্থন করেনা। আল্লাহপাক বলেন –

“ যে কেউ হত্যা করে একজন মানুষকে আরেকজন ব্যতীত অথবা দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টি কওে, সে যেন মানবজাতিকে সর্বসাকল্যে হত্যা করলো। আর যে কেউ তাকে বাচিয়ে রাখে সে যেন সমস্ত মানবজাতিকে বাচালো।” মায়েরা-৫:আয়াত-৩২

✓ তৃতীয় অপপ্রচার হলো কুরআন অথবা হাদীসের অনুবাদকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা যা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মধ্যে নেই এবং কোন সময় ছিলনা উদ্দেশ্য ইসলামের দুর্নাম রটানো।

✓ আরেকটি হলো ইসলামের ন্যায্য অনুবাদ প্রকাশ করে ঠিকই কিন্তু তা বিকৃত কৌশলে প্রয়োগ করে, ইসলাম বিদ্বৈষীদের দাবী ইসলাম পৃথিবীর জন্য মানবজাতির জন্য সমস্যা।

আসলে ইসলাম সমস্যা তো নয়ই ইসলাম মানবজাতির সকল সমস্যার একমাত্র উজ্জ্বল সমাধান.⁵⁶

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

১৫.সালমান রুশদি অথবা তাসলিমা নাসরিনের মৃত্যুদণ্ড জারি করা হয়েছে কেন?

প্রশ্ন :ইসলাম মানুষকে তথ্য প্রকাশে স্বাধীনতা দেয় তবে, সালমান রুশদি অথবা তাসলিমা নাসরিনের মৃত্যুদণ্ড জারি করা হয়েছে কেন?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামি শরীয়াত অনুযায়ী-

প্রথমত :- যে কারো প্রশংসা অথবা গুনকীর্তন করা যাবে যদি এর ফলে কারো ক্ষতি না হয়।

দ্বিতীয়ত:- যদি কারো ক্ষতি করা হয় প্রমান সহ বা প্রমান ছাড়া অথবা অপবাদ দেয়া হয় এটা অগ্রহনযোগ্য। যে কারো সম্পর্কে অভিযোগ বা দোষারোপ ইসলাম সমর্থন করে যদি তার বিরুদ্ধে প্রমান থাকে। প্রমান ব্যতিত কাউকে অপবাদ দেয়া অপরাধের নামান্তর। যদি কেউ ভদ্র মহিলার সতীত্বের বিরুদ্ধে দুর্নাম উপস্থাপন করে তাকে চারজন প্রমান হাজির কনতে হবে যদি সে না পারে কুরআনের আইন অনুযায়ী তাকে ৮০টি বার চাবুকাঘাত করা হবে। যদি আপনি মনে করেন কোন কারন ব্যতিত যে কাউকে অথবা কারও ধর্মীয় অনুভূতিকে আপনি আঘাত করবেন, কুৎসা রটাবেন ইসলাম এর অনুমতি দেয়না।

রুশদি ও ... ing’-

মার্গারেট থেচার নামক ভদ্রমহিলা ইংল্যান্ডে বিশেষ সম্মানিতা, তাঁর বিরুদ্ধে যখন আমেরিকার একজন লেখক বিশি ভাষায় ‘..’ বইতে উক্তি করানো বইটির প্রচার বন্ধ করা হয়েছিল ঠিক একইভাবে সালমান রুশদি যখন একই ভাষা +‘... ing’ ব্যবহার করে ইংল্যান্ডের সরকার তা সমর্থন জানিয়েছে। এছাড়াও রুশদি ইসলামকে সহ পুরো মানব জাতিকে অপমান করেছে

একইভাবে তাসলিমা উল্লেখ করেছেন –

‘ইসলামি শরিয়ত মেয়েদের গরুর চইতেও নীচুস্তরের প্রানীতে ভূষিত করেছে ‘লজ্জা’ নামক বইতে যদি তিনি ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে অবগত হতেন একথা তিনি উচ্চারণ করতে পারতেননা,

এমনকি রুশদি রাম-সীতাকে অপমান করতে ছাড়েনি। ইন্ডিয়া সর্বপ্রথম বইটির উপর নিষেধাঙ্গা আরোপ করে। যদি কেউ আপনার বা আমার মা-বোন কে কারন ব্যতিত

কুৎসা রটনা করে তা অগ্রহণযোগ্য এবং গুরুতর পাপের শামিল। বাইবেলে উল্লেখ আছে লেবীয় অধ্যায়–

‘সৃষ্টিকর্তার কেউ যদি অপবাদ রটায় পাথর মেরে তাকে হত্যা কর।’

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

১৬.মুসলিমগন ‘GOD’ কে আল্লাহ বলেন না কেন?

প্রশ্নঃ–মুসলিমগন ‘GOD’ কে আল্লাহ বলেন না কেন?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ বলেন –

“ আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, আল্লাহ আত্মনির্ভর ,তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি । তাঁর মত আর কেউ নেই ” সূরা ইখলাস-১১২, আয়াত-১-৪

“বলো-তোমরা আল্লাহ বলে ডাকো বা রহমান বলে ডাকো। বস্তুতঃ যে নামেই তোমরা ডাকো, তারই কিন্তু সকল সুন্দর নাম” সূরা ইসরা ১৭- আয়াত-১১০

এছারাও ‘আল্লাহ’ শব্দটি কুরআনের বিভিন্নস্থানে উল্লেখ রয়েছে। সূরা আরাফ-৭, আয়াত-১৮০/সূরা হাশর-৫৯-আয়াত-২৪,/সূরা ত্বাহা-২০, আয়াত-৮-

যে নামে আল্লাহকে ডাকা হোকনা কেন সেই নামটি হতে হবে সবচাইতে সুন্দর ও অদ্বিতীয়-

মুসলিমগন কেন আল্লাহকে ইংরেজী শব্দ ‘GOD’ বলতে পছন্দ করেনা, কারণ আরবী শব্দ ‘আল্লাহ’ অতি পবিত্র এবং শব্দের দিক হতে অতিরঞ্জিত নয়। ইংরেজী ‘GOD’ এর সাথে S যোগ করলে হয়ে যায় ‘GODs’ কিন্তু আরবীতে আল্লাহর বহুবচন নেই, আল্লাহ এক, আপনি যদি GOD এর সাথে ESS যুক্ত করেন তাহলে হবে GODESS অর্থাৎ স্ত্রী-

GOD' আরবীতে পুরুষ বা স্ত্রী আল্লাহর কোন স্থান নেই, আল্লাহ পুরুষ বা স্ত্রী নন। যদি GOD' এর ক্ষেত্রে g-অক্ষর ছোট লিখেন তাহলে হবে মিথ্যা- GOD' আর G-যদি বড় লিখেন তাহলে হবে সত্য- GOD , আল্লাহ শব্দে মিথ্যা আল্লাহ বলতে কিছুই নেই, তিনি সত্য GOD এর সাথে FATHER-যোগ করলে হয়-GOD- FATHER, আল্লাহর কোন পিতা নেই। GOD এর সাথে MOTHER যোগ করলে হবে GOD MOTHER আল্লাহর কোন মাতা নেই, একই ভাবে ইংরেজী শব্দ GOD কে নিয়ে অনেক রকমারি নাম তৈরি করা হয়েছে এবং হচ্ছে, যা আল্লাহ শব্দে নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এজন্য মুসলিমগণ আল্লাহকে তাই GOD-বলেন না।

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

১৭.ইসলাম নারীদেরকে কেন অবমূল্যায়ন করেছে?

প্রশ্নঃ ইসলাম পর্দার আড়ালে রেখে নারীদেরকে কেন অবমূল্যায়ন করেছে?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামে নারীর মর্যাদা'- ধর্মহীন প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর্যুপরি আক্রমণের লক্ষ্যস্থল- 'হিজাব' বা ইসলামী পোশাক। ইসলামী বিধি বিধানে নারী নিগ্রহের সবচাইতে বড় প্রমাণ হিসেবে যা কথায় কথায় দেখানো হয়। ধর্মীয়ভাবে নারীর জন্য রক্ষণশীল পোশাক বা পর্দা ফরয করার নেপথ্য কারণগুলো আলোচনার পূর্বে ইসলাম আগমনের পূর্বে বিশ্বসমাজে সামগ্রিকভাবে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কি ছিল তা নিয়ে কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা প্রয়োজন-

ক. ইসলাম-পূর্ব কালে নারীর-মর্যাদা বলতে কোনো ধারণার অস্তিত্ব ছিলনা। তারা ব্যবহৃত হতো ভোগ্য সামগ্রী হিসেবে।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো সর্বজনমান্য বিশ্ব-ইতিহাস থেকে তুলে আনা হয়েছে। সমুদয় মিলে যে চিত্র আমাদের চোখের সামনে উঠে আসবে তাতে আমরা সুস্পষ্ট দেখতে

পাবো ইসলাম-পূর্ব সভ্যতাগুলোতে নারীর ‘মর্যাদা’ বলতে কিছুই ছিলনা। হীন নীচ এমনকি নুন্যতম ‘মানুষ’ হিসেবেও তারা গণ্য ছিল না।

১. ব্যাবিলনীয় সভ্যতাঃ ব্যাবিলনীয় আইনে নারীর কোনো ধরনের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিলনা। মূল্য-মর্যাদা কি ছিল একটি উদাহরণে তা স্পষ্ট করে দেবে। কোনো পুরুষ যদি ঘটনাক্রমে কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকে শাস্তি দেবার পরিবর্তে তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

২. গ্রীক সভ্যতাঃ গ্রীক সভ্যতাকে পূর্বকালের সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম ও উজ্জ্বলতম গণ্য করা হয়। তথাকথিত এই উজ্জ্বলতম সভ্যতায় নারী ছিল সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত। উপরন্তু অস্তিত্বগত ভাবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। একারণে তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। গ্রীক পৌরাণিক শাস্ত্রের এক কাল্পনিক নারী যার নাম “প্যানডোরা”। বিশ্ব মানবতার সকল দুর্ভাগ্যের মূল কারণ সেই নারী। তাই গ্রীকরা নারীকে ‘প্রায় মানুষ’ অর্থাৎ মানুষের মতো বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয় বলে মনে করত। পুরুষের সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না। অপরদিকে কিছু নারীর সতীত্ব ছিল মহামূল্যবান এবং দেবীর মতো সম্মানও করা হতো। কিছুকাল পরেই এই গ্রীকরা আত্ম-অহংকারের তুঙ্গে উঠে ধরা পড়ে বিকৃত যৌনাচারের হাতে, তাদের ঘরে স্ত্রী ছিল ও বেশ্যালয়ে গমনাগমন করাও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল।

৩. রোমান সভ্যতাঃ যখন তার বিকাশের শিখর চূড়ায় তখন একজন পুরুষ যে-কোনো সময় তার স্ত্রীকে হত্যা করার অধিকার রাখতো। নগ্ন নারী যে-কোনো আসরের সৌন্দর্য এবং বেশ্যালয় যাতায়াত পুরুষের সংস্কৃতি।

৪. মিসরীয় সভ্যতাঃ মিসরীয় সভ্যতায় নারী ‘ডাইনী’ এবং শয়তানের নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতো।

ইসলাম পূর্ব আরবঃ ইসলাম পূর্ব আরবে নারীর অবস্থান ছিল ঘরের অন্যান্য ব্যবহারীক আসবাবপত্রের মতো। অনেক পিতা অসম্মানের হেতু হিসেবে তার শিশুকণ্যাকে জীবন্ত কবর দিত।

খ. ইসলাম নারীকে সম্মানে উচ্চস্তরে উঠিয়েছে। দিয়েছে তাদেরকে সমতা এবং প্রত্যাশা করে- তারা তাদের মর্যাদা রক্ষা করবে।

ইসলাম নারীর মর্যাদাকে ওপরে উঠিয়েছে এবং নিশ্চিত করেছে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে। ইসলাম নারীর মর্যাদাকে সংরক্ষণ করতে চায়।

পুরুষের পর্দাঃ মানুষ সাধারণত পর্দা নিয়ে আলোচনা করে নারীদের ক্ষেত্রে। অথচ জ্যোতীর্ময় কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নারীর পর্দার আগে পুরুষের পর্দার কথা বলেছেন। সূরা নূরে বলা হয়েছে-

“বলো! বিশ্বাসী পুরুষদেরকে- তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের শালীনতা রক্ষা করে। এটা তাদেরকে আরো পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন (মানসিকতার) করে তুলবে, আর আল্লাহ কিন্তু সেই সব কিছুই জানেন যা তোমরা করো। ” (২৪:৩০)

যে মুহুর্তে কোনো পুরুষ একজন নারীর দিকে তাকাবে- লজ্জাকর অশ্লীল চিন্তা তার মনে এসে যেতে পারে। কাজেই তার দৃষ্টি অবনত রাখাই তার জন্য কল্যাণকর।

নারীর জন্য পর্দাঃ সূরা নূরের পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছেঃ

“এবং বলো, বিশ্বাসী নারীদেরকে- তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের সযত্ন সংরক্ষণ করে এবং তাদের দৈহিক সৌন্দর্য ও অলংকারের প্রদর্শনী না করে। তবে অনিবার্য ভাবে যা উন্মুক্ত থাকে। তারা যেন তাদের বক্ষের ওপরে চাদর ঝুলিয়ে দেয় এবং প্রদর্শন না করে তাদের সৌন্দর্য, তাদের স্বামী তাদের পিতা তাদের স্বামীর পিতা (শশুর) এবং সন্তানদের ছাড়া। ” (২৪:৩১)

গ. হিজাবের ছয়টি শর্ত

কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী হিজাব পালনের ছয়টি শর্ত।

১. মাত্রা বা পরিমাণঃ প্রথম শর্ত হলো দেহের সীমানা যা যতটুকু-অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। নারী ও পুরুষের জন্য এটা ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষের জন্য ঢেকে রাখার বাধ্যতামূলক

পরিসীমা তার দেহের ন্যূনতম নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নারীর জন্য এই পরিসীমা আরো বিস্তৃত- কজ্জী পর্যন্ত হাত এবং মুখমন্ডল ছাড়া বাদবাকি শরীরের সকল অংশ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। তারা যদি চায় তাহলে তা-ও আবৃত করে নিতে পারে। ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অনেকেই হাত ও মুখমন্ডলকেও বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখার অংশ মনে করেন। বাদবাকি পাঁচটি শর্ত নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই রকম প্রযোজ্য-

২. পরিধেয় পোশাক ডিলেডালা হতে হবে। যেন দেহের মূল কাঠামো প্রকাশ না পায়।

৩. পরিধেয় কাপড় এতটা পাতলা ও স্বচ্ছ হতে পারবেনা যাতে ভেতরটা দেখা যায়।

৪. পোশাক এতটা আকর্ষণীয় ও জাকজমকপূর্ণ হতে পারবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষিত হয়।

৫. পোশাক এমন হতে পারবে না যা বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মতো বা সমরূপ।

৬. পোশাক এমন হতে পারবে না দেখতে অবিশ্বাসীদের মতো। তাদের এমন কোনো পোশাক পরা উচিত নয় যা বিশেষভাবে পরিচিত এবং চিহ্নিত অন্য ধর্মাবলম্বীদের (যারা মূলত অবিশ্বাসী)।

ঘ. অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আচার-আচরণও হিজাবের অন্তর্ভুক্ত

হয় ধরনের পরিচ্ছদের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ পর্দা ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, অভিব্যক্তি এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যকেও একিভূত করে। একজন ব্যক্তি সে যদিও শুধু কাপড়-চোপড়ে হিজাব পালন করে তাহলে সে ‘হিজাব’ পালক করলো ন্যূনতম পর্যায়ে। পোশাকের পর্দা পালনের সাথে সাথে চোখের পর্দা, মনের পর্দা, চিন্তা-ভাবনার পর্দা এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পর্দাও থাকতে হবে। পর্দার সীমার মধ্যে আরো যা পড়ে, তা হলো- ব্যক্তির চলা, কথা বলা এবং তার সার্বিক আচরণ ইত্যাদি।

ঙ. হিজাব বা পর্দা অহেতুক উৎপীড়ন প্রতিরোধ করে

নারীকে কেন পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে কুরআন তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। সূরা আহযাবে বলা হয়েছেঃ-

”হে নবী! বলুন আপনার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং বিশ্বাসী নারীদেরকে যে, তারা যেন তাদের বহিরাবরণ পরে থাকে (যখন বাইরে যাবে)। এটা তাদের পরিচিতির অত্যন্ত উপযোগী। (তারা যেন পরিচিত হয়ে বিশ্বাসী-নারী হিসাবে) তাহলে আর অহেতুক উৎপিড়িত হবে না। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল দয়াবান। ” (৩৩:৫৯)

জ্যোতীময় কুরআন বলছেঃ- নারীকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে এই জন্য যে, তারা যেন রুচিশীলা পরিচ্ছন্ন নারী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এবং এটা তাদেরকে লজ্জাকর উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করবে।

চ. দু’টি জমজ বোনের উদাহরণ

ধরা যাক জমজ দু’টি বোন। উভয়ই অপূর্ব সুন্দরী। ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন পরেছে ইসলামী হিজাব। অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহ আবৃত। শুধু কজী পর্যন্ত হাত ও মুখমন্ডল খোলা। অন্যজন পরেছে পশ্চিমা পোশাক। শরীরের অধিকাংশ খোলা এবং প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ। সামনেই এক মোড়ে আড্ডা দিচ্ছে একদল উশ্জ্বল যুবক মেয়েদেরকে দেখে হৈ-হল্লা করা, শীশ দেয়া আর বাগে পেলে উত্ত্যক্ত করাই তাদের কাজ। এখন এই দুই বোনকে যেতে দেখে তারা কাকে উদ্দেশ্য করে হল্লা করবে ? শীশ দেবে ? যে মেয়েটি নিজেকে ঢেকে রেখেছে তাকে দেখে? না যে মেয়েটি প্রায় উদোম হয়ে আছে তাকে দেখে? খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের চোখ যাবে যে কিনা দেখাতে চায় তার দিকে। কার্যত এ ধরনের পোশাক বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ‘ভাষাহীন নিরব আমন্ত্রণ’। যে কারণে বিপরীত লিঙ্গ উত্তেজিত হতে বাধ্য হয়। জ্যোতীময় কুরআন যথার্থই বলেছে- ‘হিজাব নারীদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করে’।

ছ. ধর্ষকের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

ইসলামের বিধান অনুযায়ী একজন পুরুষ যদি কোনো নারী ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তার শাস্তি প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড। অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন এই কঠিন বাক্য শুনে। কেউ কেউ তো বলেই বসেন, ইসলাম অত্যন্ত নিষ্ঠুর, বর্বরদের ধর্ম। শত শত অমুসলিম পুরুষের কাছে আন্তরিকভাবে জানতে চেয়েছি- ধরুন, আল্লাহ না করুন

কেউ একজন আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে অথবা আপনার বোন বা কন্যা। আপনাকে বিচারকের আসনে বসানো হয়েছে এবং ধর্ষণকারীকে আপনার সামনে হাজির করা হয়েছে। কি শাস্তি দেবেন তাকে? প্রত্যেকেই উত্তর একটিই-“মৃত্যুদণ্ড”। কেউ বলেছেন, ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে আমার চোখের সামনে ব্রাস ফায়ার করে ঝাঝরা করে দিতে বলব। কেউ বলেছেন ওকে তিল তিল করে মৃত্যুর স্বাদ দিয়ে মারতে বলব। এই উত্তর দাতাদের কাছেই আমার প্রশ্ন, আপনার মা-বোন স্ত্রী কন্যাকে কেউ ধর্ষণ করলে তাকে ওভাবে মেরে ফেলতে চান। কিন্তু এই একই অপরাধ যদি অন্য কারো স্ত্রী-কন্যার ওপর ঘটে তখন এই আপনিই বলেন মৃত্যুদণ্ড অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুর হয়ে যায়। কেন ভাই, একই অপরাধের জন্য ক্ষেত্রভেদে দুই রকম দণ্ড?

জ.নারীকে মর্যাদা দেবার পশ্চিমা সমাজের দাবি সর্বৈভ মিথ্যাচার

নারী স্বাধীনতার পশ্চিমা শ্লোগান একটি প্রকাশ্য প্রতারণা। তার দেহের সৌন্দর্যকে খুলে খুলে ব্যবসা করার একটি লোভনীয় ফাঁদ। তার আত্মার অবমাননা এবং তার সম্মান ও মর্যাদাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর প্রকাশ্য বাস্তবতা হলো তাদেরকে তাদের সম্মানিত অবস্থান থেকে নামিয়ে উপপত্নী, রক্ষিতা এবং সৌখিন সমাজের লালসা পূরনের জন্য উদ্ভূত প্রজাপতি বানিয়ে ছেড়েছে। ফলে তারা এখন বিলাসী পুরুষের নাগালের মধ্যে থাকা ভোগের পুতুল আর যৌন কারবারীদের ব্যবসায়ের সস্তা পণ্য। যা আড়াল করা হয়েছে শিল্প ও সংস্কৃতির মনোলোভা রঙিন পর্দা দিয়ে।

ঝ. নারী ধর্ষণের হার আমেরিকায় সর্বোচ্চ

উন্নত বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবস্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নৈমিত্তিক সংঘটিত নারী ধর্ষণের হার সারা বিশ্বে তার রেকর্ড কেউ স্পর্শও করতে পারবে না। ১৯৯০ সালের এফবিআই-এর দেয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রতিদিন গড়ে ১৭৫৬ টি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যাতে প্রতিদিন সংঘটিত ধর্ষণ অপরাধে সংখ্যা ১৯০০ উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে সন

উল্লেখ করা নেই তবে অনুমান করা হয় তা ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সালের কথা। হয়তো আমেরিকানরা পরবর্তী দু’তিন বছরে আরো ‘সাহসী’ হয়ে উঠেছে।

আবার একটা কাল্পনিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করা যাক- আমেরিকান নারী সমাজ ইসলামী হিজাব পালন করছে। যখনি কোনো পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকাচ্ছে, কোনো অশ্লীল চিন্তা মনে এসে যেতে পারে ভাবার সাথে সাথে সে তার দৃষ্টিকে নীচে নামিয়ে নিচ্ছে। পথে ঘাটে যেখানেই কোনো নারী দৃশ্য হচ্ছে, কজী পর্যন্ত তার দুটি হাত আর নেহায়েত সাদামাটা সাজগোজহীন মুখমন্ডলের কিয়দাংশ ব্যাস, বাদবাকি সব ডোলাডালা হিজাবে ডাকা। তদুপরি রাষ্ট্রীয় বিধান এমন যে, যদি কোনো পুরুষ ধর্মণের অপরাধ করে তার জন্য নির্দিষ্ট-জনসমক্ষে প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড।

এবার আপনাকে প্রশ্ন করছি, গোটা পরিবেশটা যদি সত্যি সত্যিই এমন হয় তাহলে আমেরিকার এই নারী ধর্মণের ভঙ্কর হার বাড়তে থাকবে না একই অবস্থানে থাকবে? নাকি কমে যাবে এবং কমতে কমতে একদিন এই জঘন্য অপরাধ নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এং. ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ বিধান কার্যকর হলে ধর্মণের হার শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। কেননা শরীয়তের বিধান, মানুষেরই জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা বিধাতার নির্বাচিত বিধিবিধান যদি কার্যকর হয় তাহলে তার ফলাফল কল্যাণী অমিয় ধারা হয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করবে। ইসলামী শরীয়ত যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় পৃথিবীর যে কোনো ভূখন্ডে- তা আমেরিকাই হোক অথবা ইউরোপ বা পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো দেশে। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, সে দেশের গোটা সমাজ একসাথে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবে।

কাজেই ‘হিজাব’ নারীকে অপদস্ত করেনি বরং উপরে তুলে সম্মানের আসন দিয়েছে। আর সংরক্ষণ করেছে তার শালীনতা ও পবিত্রতা।

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

১৮.মুসলিমরা কেন এতো পশু হত্যা করে?

প্রশ্নঃ একটি পশুকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ। তাহলে মুসলিমরা কেন এতো পশু হত্যা করে?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

‘নিরামিষবাদ’ বিশ্বব্যাপী এখন একটা বিফল আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। অনেকেই এমনকি এটাকে যুক্ত করেছে ‘পশু অধিকারের’ সাথে। সন্দেহ নেই জনগণের একটি বিশাল অংশ মনে করেন মাংস ভক্ষণ এবং অন্যান্য উৎপাদিত আমিষ দ্রব্যসামগ্রী ‘পশু অধিকার’ কে হরণ করে।

ইসলাম আদেশ করে সকল সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া ও অনুকম্পার নীতি গ্রহণ করতে। একই সাথে ইসলাম এ বিশ্বাসও লালন করে যে, এ পৃথিবীর যাবতীয় ফুল-ফল তথা উদ্ভিদ ও পশুপাখি এবং জলজপ্রাণী, সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের সেবার জন্য। এর পরের দায়িত্ব মানুষের, এসব সম্পদ ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যবহার করা এবং আল্লাহর এই নেয়ামত (বিশেষ অনুগ্রহ) ও আমানত সমূহের যথাযথ সংরক্ষণ তাদেরই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিতর্কের সম্ভাব্য আরো কিছু দিক পর্যালোচনা করে নেয়া যাক।

ক. একজন মুসলিম সম্পূর্ণ নিরামিষভোজীও হতে পারে

একজন মুসলিম সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী হয়েও প্রথম শ্রেণীর মুসলিম থাকতে পারেন।

এটা বাধ্যতামূলক কিছু নয় যে, একজন মুসলিমকে আমিষ খাদ্য খেতেই হবে।

খ. জ্যোতির্ময় কুরআন মুসলিমদেরকে আমিষ খাবারের অনুমতি দেয়

মুসলিমদের পথ প্রদর্শক আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ তার প্রমাণ। বলা হচ্ছেঃ-

”হে ঈমান ধারণকারীরা! পূরণ করো তোমাদের প্রতি সকল অর্পিত দায়িত্ব। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে (খাবার জন্য) সকল চতুষ্পদ জন্তু-অন্য কারো নামে তা জবাই করা না হয়ে থাকলে। ” (সূরা মায়েদা-৫:১)

”আর গৃহপালিত পশু তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য ওগুলো থেকে তোমরা উষ্ণতা পাও (গরমের পোশাক) এবং আরো অসংখ্য উপকারী জিনিস। আর সেগুলো(গোস্ত) তোমরা খাও। ” (সূরা নাহল- ১৬:৫)

“আর গৃহপালিত পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শেখার মতো উদাহরণ। ওগুলো দেহ-অভ্যন্তর থেকে আমরা এমন কিছু উৎপাদন করি (দুধ) যা তোমরা পান করো। ওগুলোর মধ্যে অসংখ্য উপকার আছে তোমাদের জন্য আর ওগুলো (গোস্ত) তোমরা খাও। ” (সূরা মুমিনুন- ২৩:২১)

গ. মাংস পুষ্টিকর এবং আমিষে ভরপুর

আমিষ খাদ্য প্রোটিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস। জৈবীক ভাবেই তা প্রোটিন সমৃদ্ধ। আটটি অতি প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিড যা দেহের দ্বারা সমন্বিত হয় না। তাই খাদ্যের মাধ্যমে তা সরবরাহ করতে হয়। মাংসের মধ্যে আরো আছে লৌহ, ভিটামিন বি-১ এবং নিয়াসিন।

ঘ. মানুষের দাঁত সব রকম খাদ্য গ্রহণে সক্ষম করে বিন্যস্ত

আপনি যদি পর্যবেক্ষণ করেন তৃণভোজী প্রাণীর দাঁতের বিন্যাস-যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ ইত্যাদি। আপনি দেখে আশ্চর্য হবেন যে, তা সব একই রকম। এসব পশুর দাঁত ভোঁতা (সমতল) যা তৃণ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের জন্য উপযোগী। আপনি যদি লক্ষ্য করেন মাংসাশী পশুদের দন্ত বিন্যাস অর্থাৎ বাঘ, সিংহ, লিউপার্ড, শৃগাল, হায়েনা ইত্যাদি-এগুলোর দাঁত ধারালো যা মাংসের জন্য উপযোগী। মানুষের দাঁত লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে সমতলের ভোঁতা দাঁত যেমন আছে তেমনি ধারালো এবং চোখা দাঁতও আছে। অর্থাৎ মানুষের দাঁত মাংস ও তৃণ উভয় ধরনের খাদ্য গ্রহণের জন্য উপযোগী। এক কথায় ‘সর্বভুক’।

কেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি চাইতেন মানুষ শুধু তরিতরকারী খাবে তাহলে আমাদের মুখে ধারালো দাঁত ক'টি দিলেন কেন? এর দ্বারা এটাই কি প্রমাণিত হয়না যে, খোদ সৃষ্টিকর্তাই চান যে, মানুষ সব ধরনের খাবার গ্রহণ করুক।

ঙ. আমিষ ও নিরামিষ দুই ধরনের খাদ্যই মানুষ হজম করতে পারে।

তৃণভোজী প্রাণির হজম প্রক্রিয়া শুধু তৃণ জাতীয় খাদ্যই হজম করতে পারে। মাংসাশী প্রাণীর হজম প্রক্রিয়া পারে শুধু মাংস হজম করতে। কিন্তু মানুষের হজম প্রক্রিয়া তৃণ ও মাংস উভয় ধরনের খাদ্যই হজম করতে সক্ষম।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি চাইতেন আমরা শুধু নিরামিষ ভক্ষণ করি তাহলে তিনি আমাদেরকে এমন হজম শক্তি দিলেন কেন যা দিয়ে তৃণ ও মাংস উভয় ধরনের খাদ্যই হজম করা যায়?

চ. হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়

১. অসংখ্য হিন্দু রয়েছে যারা নিষ্ঠাবান নিরামিষ ভোজি। তারা আমিষ খাদ্যকে তাদের ধর্ম বিরোধী মনে করে। অথচ আসল সত্য হলো, হিন্দু শাস্ত্রই মাংস খাবার অনুমতি দিয়েছে। গ্রন্থসমূহ উল্লেখ করেছে- পরম বিজ্ঞ সাধু-সন্তরা আমিষ খাবার গ্রহণ করতেন।

২. হিন্দুদের আইনের গ্রন্থ মনুশ্রুতি পঞ্চম অধ্যায় শ্লোক ৩০এ আছে-

”খাদ্য গ্রহণকারী যে খাবার খায়, সেই সব পশুর যা খাওয়া যায়,মন্দ কিছু করে না।এমনকি সে যদি তা করে দিনের পর দিন। ঈশ্বর নিজেই সৃষ্টি করেছেন কিছু ভক্ষিত হবে আর কিছু ভক্ষণ করবে।”

৩. মনুশ্রুতীর পঞ্চম অধ্যায়ের ৩১শ্লোকে আবার বলা হয়েছে-

”যা মাংস ভক্ষণ শুদ্ধ উৎসের জন্য। ঈশ্বরের বিধান হিসেবে বংশ পরম্পরায় তা জানা আছে।”

৪. এরপরে মনুশ্রুতীর পঞ্চম অধ্যায়ের ৩৯ এবং ৪০ শ্লোকে বলা হয়েছেঃ

”ঈশ্বর নিজেই সৃষ্টি করেছেন উৎসর্গের পশু উৎসর্গের জন্যই। সুতরাং উৎসর্গের জন্য হত্যা নয়।”

৫. মহাভারত অনুশীলন পর্ব ৮৮ অধ্যায় বর্ণনা করছে-

”ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও পিতামহ ভীষ্ম, এদের, এদের মধ্যে কথোপকথন কেউ যদি শ্রদ্ধ করতে চায় তাহলে সে অনুষ্ঠানে কি ধরনের খাবার খাওয়ালে স্বর্গীয় পিতৃ পুরুষ (এবং মাতাগণ) সন্তুষ্ট হবেন। যুধিষ্ঠির বলল, হে মহাশক্তির মহাপ্রভু! কি সেই সব বস্তু সামগ্রী যাহা-যদি উৎসর্গ করা হয় তাহলে তারা প্রশান্তি লাভ করবে? কি সেই বস্তু সামগ্রী যা (উৎসর্গ করলে) স্থায়ী হবে? কি সেই বস্তু যা (উৎসর্গ করলে) চিরস্থায়ী হবে? ভীষ্ম বলেছেন, তাহলে শোন হে যুধিষ্ঠির! কী সেই সব সামগ্রী। যারা গভীর জ্ঞান রাখে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পর্কে- যা উপযোগী শ্রাদ্ধের জন্য। আর কি সেই ফল-ফলাদি যা তার সঙ্গে যাবে। সীম বিচীর সাথে চাল, বালী এবং মাশা এবং পানি আর বৃক্ষমূল (আদা, আলু বা মূলা জাতীয়) তার সাথে ফলাহার। যদি স্বর্গীয় পিতৃদেবদের শ্রাদ্ধে দেয়া হয়। হে রাজা! তা হলে তারা এক মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে।”

”শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৎস সহকারে আপ্যায়ন করলে স্বর্গীয় পিতৃকুল দুই মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। ভেড়ার মাংস সহকারে- তিন মাস। খরগোশ সহকারে চারমাস। ছাগ-মাংস সহকারে ৫ মাস। শূকর-মাংস সহকারে ছয় মাস। পাখীর মাংস দিয়ে আপ্যায়িত করলে সাত মাস। হরিণের মধ্যে ‘প্রিসাতা’ হরিণ শিকার করে খাওয়ালে আট মাস এবং ‘রুরুর’ হরিণ দিলে নয় মাস। আর গাভীর মাংস দিলে দশমাস। মহিসের মাংস দিলে তাদের সন্তুষ্ট এগারো মাস বজায় থাকে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গরুর মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করলে, বিশেষ করে বলা হয়েছে তাদের সন্তুষ্ট থাকে পুরো এক বছর। ঘি মিশ্রিত পায়েশ, স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের কাছে গরুর মাংসের মতোই প্রিয়। ভদ্রিনাসার (বড় ষাড়) মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করলে পিতৃপুরুষ বার বছর সন্তুষ্ট থাকেন। পিতৃপুরুষের মৃত্যু বার্ষিকি গুলোর যে দিনটিতে সে মারা গেছে সেই রকম একটি দিন দিন যদি শুক্ল পক্ষের হয় আর তখন যদি গভারের মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আপ্যায়ন করা যায়- স্বর্গীয় পিতৃ পুরুষের

সন্তুষ্টি অক্ষম হয়ে যায়। ‘কালাসকা’ কাঞ্চন ফুলের পাপড়ি আর লাল ছাগলের মাংস যদি দিতে পারো তাহলেও তাদের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে যাবে।”

অতএব আপনি যদি চান আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে যাক তাহলে লাল ছাগলের মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আপ্যায়ন করতে হবে।

ছ.হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ তার অনুসারীদের আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। তথাপি অনেক হিন্দু নিরামিষ ভোজনকে সংযোজন করে নিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এটা এসেছে ‘জৈন’ ধর্ম থেকে।

জ. উদ্ভিদেরও জীবন আছে

বিশেষ কিছু ধর্ম খাদ্য হিসেবে শুধুমাত্র নিরামিষ খাবার বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে। কারণ তারা জীব হত্যার সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি কেউ কোনো সৃষ্ট জীবকে হত্যা না করে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে নির্দিধায় বলতে পারি, আমি হবো প্রথম ব্যক্তি যে এধরনের জীবন যাপন পদ্ধতিকে বেছে নেবে।

অতীত কালের মানুষ মনে করত উদ্ভিদের প্রাণ নেই। অথচ আজ তা বিশ্ববাসীর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। কাজেই সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজী হয়েও জীব হত্যা না করার শর্ত পূরণ হচ্ছে না।

ঝ. উদ্ভিদ ব্যাথাও অনুভব করতে পারে

এর পরেও হয়তো নিরামিষ ভোজীরা বলবেন, প্রাণ থাকলে কি হবে উদ্ভিদ ব্যাথা অনুভব করতে পারে না। তাই পশু হত্যার চাইতে এটা তাদের কম অপরাধ। আজকের বিজ্ঞান পরিষ্কার করে দিয়েছে উদ্ভিদও ব্যাথা অনুভব করে কিন্তু তাদের সে আর্ত চিৎকার মানুষই শোনার ক্ষমতা রাখে না ২০ Hertz থেকে ২০০০ Hertz এর ওপরে বা নীচের কোনো শব্দ মানুষের শ্রুতি ধারণ করতে সক্ষম নয়। একটি কুকুর কিন্তু শুনতে পারে ৪০,০০০ Hertz পর্যন্ত। এজন্য কুকুরের জন্য নিরব ‘হাইসেল’ বানানো

হয়েছে যার ফ্রীকোয়েন্সী ২০,০০০ Hertz এর বেশী এবং ৪০,০০০ Hertz এর মধ্যে। এসব হুইসেল শুধু কুকুর শুনতে পারে, মানুষ পারে না। কুকুর এ হুইসেল শুনে তার মালিককে চিনে নিতে পারে এবং সে চলে আসে তার প্রভুর কাছে।

আমেরিকার এক খামারের মালিক অনেক গবেষণার পর একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে উদ্ভীদের কান্না মানুষের শ্রুতিযোগ্য করে তোলা যায়। সে বিজ্ঞানী বুঝে নিতে পারত, উদ্ভীদ কখন পানির জন্য চিৎকার করত। একেবারে এখনকার গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, উদ্ভীদ সুখ ও দুঃখ অনুভব করতে পারে এবং পারে চিৎকার করে কাঁদতেও।

এ৪. দু'টি ইন্দ্রিয়ানুভূতী কম সম্পন্ন প্রাণীকে হত্যা করা কম অপরাধ নয়

এবার নিরামিষ ভোজীরা তর্কে অবতীর্ণ হবেন যে, উদ্ভীদের মাত্র দু'টি অথবা তিনটি অনুভূতির ইন্দ্রিয় আছে আর পশুর আছে পাঁচটি। কাজেই পশু হত্যার চাইতে উদ্ভীদ হত্যা অপরাধের দিক থেকে কম।

ধরুন এক ভাই জন্মগত ভাবেই অন্ধ ও কালো। চোখে দেখেনা কানেও শোনেনা। অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় দুটি ইন্দ্রিয় তার কম। সে যখন পূর্ণ যৌবনে এসে পৌঁছাল তখন এক লোক নির্দয়ভাবে তাকে খুন করল। খুনী ধরা পড়ার পর-বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে আপনি কি বিচারপতিকে বলবেন, মহামান্য আদালত খুনিকে আপনি পাঁচ ভাগের তিন ভাগ শাস্তি দিন?

জ্যোতীর্ময় কুরআন বলেছেঃ-

”হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে পবিত্র ও উত্তম (জিনিসগুলো) খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করো।”

ট. গৃহপালিত পশুর সংখ্যাধিক্য

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যদি ফল-মূল তরিতরকারী ও শাক শজীকেই খাবার হিসাবে বেছে নেয় তা হলে গবাদী পশুর জন্য ভু-পৃষ্ঠ ছেড়ে দিয়ে মানুষকে অন্য কোনো গ্রহে

গিয়ে বাস করতে হবে। আর খাল বিল নদী নালা ও সাগর মহাসাগর পানি শূন্য হয়ে যাবে মাছ ও অন্যান্য জ্বলজ প্রাণীর আধিক্য। কেননা উভয় শ্রেণীর জন্মের হার ও প্রবৃদ্ধি এত বেশি যে, এক শতাব্দী লাগবে না এ পৃথিবী তাদের দখলে চলে যেতে।

সুতরাং সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালা খুব ভালো করে জানেন এবং বোঝেন। তাঁর সৃষ্টিকুলের ভারসাম্য তিনি কিভাবে রক্ষা করবেন। কাজেই এটা খুব সহজেই অনুমেয় যে, তিনি কি কারণে আমাদেরকে মাছ মাংস খাবার অনুমতি দিয়েছেন।

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র।

১৯. শুকর মাংস নিষিদ্ধ কেন?

প্রশ্নঃ শুকর মাংস নিষিদ্ধ কেন?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

এটা সর্বজন বিদিত যে, শুকুর মাংস ভক্ষণ ইসলামে নিষিদ্ধ। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো এই নিষিদ্ধতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরবে।

ক. কুরআনে শুকুর মাংস নিষিদ্ধতা

শুকুরের মাংস খাওয়া নিষেধ অন্তত চারটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে ২:১৭৩, ৫:৩, ৬:১৪৫, এবং ১৬:১১৫-

“নিষিদ্ধ করা হলো তোমাদের জন্য (খাদ্য- হিসেবে) মৃত জন্তুর মাংস, প্রবাহিত রক্ত, শুকুরের মাংস “

কেন নিষেধ করা হয়েছে তার সন্তোষজনক উত্তরের জন্য কুরআনের উল্লেখিত আয়াত সমূহেই যথেষ্ট।

খ. বাইবেল শুকুর মাংস ভক্ষণের নিষিদ্ধতা

একজন খ্রীস্টান তার ধর্মগ্রন্থ সমূহের উল্লেখ দেখে সন্তুষ্ট হলে দেখতে পারে যে, বাইবেল লেবীয় অধ্যায়ে শুকুরের মাংস খেতে নিষেধ করেছে। বলা হয়েছেঃ-

”এবং শুকুর যদিও তার খুর দ্বিখন্ডিত এবং খুরযুক্ত পদ বিশিষ্ট। এমন কি সে চিবিয়ে খায়, যাবর কাটেনা। (তবু) ওটা অপরিচ্ছন্ন (অপবিত্র) তোমার জন্য”।

একই গ্রন্থের ১১ অধ্যায় ৭ ও ৮ স্তবকে বলা হয়েছেঃ-

”ওগুলোর মাংস তুমি খাবে না এবং ওগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শও করবে না, ওগুলো ‘অপবিত্র’ তোমার জন্য।”

বাইবেলের পঞ্চম গ্রন্থ ‘দ্বিতীয় বিবরনী’ তেও শুকুর মাংস ‘অপবিত্র’ বলা হয়েছেঃ-

“আর শুকুর- কারণ তার খুর দ্বিখন্ডিত, এমনকি চিবিয়ে খায়, যাবর কাটেনা, ওটা অপবিত্র তোমার জন্য তুমি ওগুলোর মাংস খাবে না, না ওগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শ করবে। (দ্বিতীয় বিবরনীঃ ১৪:৮)

বাইবেলের ‘আইযায়াহ, গ্রন্থের ৬৫ অধ্যায় ২ থেকে ৫ স্তবকেও একই নিষিদ্ধতা রয়েছে।

গ. শুকুর মাংস ভক্ষণ বেশ কিছু মারাত্মক রোগের কারণ

অন্যান্য অমুসলিম ও নাস্তিকরা হয়তো উপযুক্ত কারণ ও বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাণের মেনে নিতে পারে- শুকুর মাংস ভক্ষণ কমপক্ষে সত্তুরটি রোগের উদ্ভব ঘটাতে পারে।

প্রথমতঃ আক্রান্ত হতে পারে বিভিন্ন প্রকার ক্রিমির দ্বারা। যেমন বৃত্তাকার ক্রিমি, ক্ষুদ্র কাঁটায়ুক্ত ক্রিমি এবং বক্র ক্রিমি। এর মধ্যে সবচাইতে ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক হলো ‘টাইনিয়া সোলিয়াম’। সাধারণভাবে যেটাকে ফিতা ক্রিমি’ বলা হয়। এটা পেটের মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং অনেক লম্বা হয়। এর ডিম রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে এবং দেহের প্রায় সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঢুকে পড়তে পারে, যদি এটা মস্তিস্কে ঢোকে, তাহলে কারণ ঘটতে পারে স্মৃতি ভ্রষ্ট হয়ে যাবার। হৃদ-যন্ত্রের মধ্যে ঢুকলে বন্ধ করে দিতে পারে হৃদযন্ত্রক্রিয়া। চোখে ঢুকতে পারলে অন্ধত্বের কারণ, কলিজীতে ঢুকতে পারলে সেখানে

মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে অর্থাৎ এটা শরীরের যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

এরপরও আছে আরো ভয়ঙ্কর ‘ত্রীচুরা টিচুরাসীস্থ’। এ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা হলো ভালো করে রান্না করলে এর ডিম্ব মারা যায়। এর ওপরে আমেরিকায় গবেষণা চালানো হয়েছে। ফলাফল ভালো করে রান্না করার পরও প্রতি ২৪ জনের ২২ জন এই ‘ত্রীচুরাসীস্থ’ দ্বারা আক্রান্ত। প্রমাণিত হলো সাধারণ রান্নায় এ ডিম্ব ধ্বংস হয় না।

ঘ. শুকর মাংসে চর্বি উৎপাদনের উপাদান প্রচুর

শুকর মাংসে পেশী তৈরীর উপাদান অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণ। পক্ষান্তরে চর্বি উৎপাদনের উপাদান প্রচুর। এ জাতীয় চর্বি বেশিরভাগ রক্ত নালীতে জমা হয়- যা কারণ ঘটায় হাইপার টেনশান এবং হার্ট এটাকের। অবাক হবার কিছু নেই যে ৫০% ভাগ আমেরিকান হাইপার টেনশানের রুগী।

ঙ. পৃথিবীর বুকে শুকর নোংরা ও পঙ্কিলতম প্রাণী

এ প্রাণীটি বসবাস করতে সাচ্ছন্দ বোধ করে নিজেদের বিষ্ঠা, মানুষের মল ও ময়লাপূর্ণ জায়গায়। আল্লাহ তা‘আলা সমাজবদ্ধ সৃষ্টি কূলের ধাঙর, মেথর বা ময়লা পরিষ্কারক হিসাবেই বোধকরি এ প্রাণীটি সৃষ্টি করেছেন আজ থেকে পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগেও যখন সেনিটারী পায়খানা আবিষ্কৃত হয়নি তখন যে কোনো শহরের পায়খানার ধরন ছিল, পেছন থেকে মেথর এসে তা ট্যাঙ্কি ভরে নিয়ে যেত এবং শহরের উপকণ্ঠে কোথাও ফেলতো। যা ছিল শুকরদের পরম আনন্দ নিবাস এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলোই সব বিষ্ঠার রূপান্তর ঘটতো।

অনেকেই হয়তো এখন বিতর্কে নেমে পড়বেন উন্নত বিশ্বে এখন শুকরের পরিচ্ছন্ন খামার করা হয়েছে যেখানে ওগুলো লালিত পালিত হয়। তাদের এই অনেক উন্নত, স্বাস্থ্যকর খামারেও ওগুলো নোংরা। অত্যন্ত আনন্দের সাথেই ওরা ওদের নিজেদের ও সঙ্গিদের বিষ্ঠা নিয়ে ওদের চোখা নাক দিয়ে নাড়া চড়া করে আর উৎসবের খাদ্য হিসেবেই খায়।

চ. শুকর নির্লজ্জতায় জঘন্য পশু

ভু-পৃষ্ঠের ওপরে শুকর অশ্লীলতায় নির্লজ্জতম প্রাণী। একমাত্র পশু যেটা তার স্ত্রী-সঙ্গীর সাথে সংগম করার জন্য অন্যান্য পুরুষ-সঙ্গীদের ডেকে নেয়। আমেরিকার ও ইউরোপের অধিকাংশ মানুষের প্রিয় খাদ্য শুকর মাংস। খাদ্যভ্যাস আচরণে প্রকাশ পায়, বিজ্ঞানের এ সূত্রের জীবন্ত নমুনা ওরাই। ওদের প্রিয় সংস্কৃতি ডান্স পার্টি গুলোতে নেচে নেচে উত্তেজনার তুঙ্গে উঠে একে অপরের সাথে 'সোয়া'র জন্য বউ বদল করে নেয়। অনেকেই আবার জীবন্ত নীল ছবি চোখে দেখার জন্য স্ত্রীর সাথে সংগম করতে বন্ধু-বান্ধব ডেকে নেয়। তারপর এক নারী নিয়ে চলে অনেক পুরুষের সম্মিলিত লীলাখেলা। 'ধন্য' উন্নত বিশ্ব, 'ধন্য' তার সর্বোন্নত সংস্কৃতি।

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র।

২০. ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ কেন?

প্রশ্নঃ ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ কেন?

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ।

স্মরণাতীত কাল থেকে বিশ্বমানবতার জন্য 'এলকোহল' তীব্র যন্ত্রনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। মদ অসংখ্য অগুনতী মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ এবং বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি মানুষের ভয়ঙ্কর দুর্দশার কারণ। মানুষের সমাজে অসংখ্য সমস্যার নেপথ্যে আসল হেতু এই 'এলকোহল' বা মদ। অপরাধ প্রবনতার তীব্র উর্ধগতী, ক্রমবর্ধমান মানসিক বিপর্যয় এবং কোটি কোটি ভাঙা সংসার জীবন্ত প্রমাণ বহন করছে বিশ্ব জুড়ে এলকোহলের নিরব ধ্বংসযজ্ঞের তান্ডবলীলা কি ভাবে চলছে।

ক. কুরআনে মদ্যপানে নিষিদ্ধতা-

”হে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা! মদ ও জুয়া, পাশা খেলা, তীর ছুঁড়ে ভাগ্য জানা এগুলো শয়তানের নিকৃষ্ট ধরনের জঘন্য কারসাজি। এসব পরিহার করো যেন তোমরা উন্নত (মানবতার) পথে এগিয়ে আসতে পারো। ” (সুরা মায়েদা- ৫: ৯০)

খ. বাইবেলে মদের নিষিদ্ধতা -

১. “মদ্য একটি প্রতারক, কঠিন পানীয়, কুৎসীত কাজের উৎসাহক এবং যে এতে অভ্যস্ত হলো সে মুর্থতায় নিমজ্জিত হলো। ” (বাইবেলের নীতিবাক্য, মূল গ্রন্থঃ ২০-১)

২. আর মদ্য পানে মাতাল হয়ো না। (এফিসিয়ানেসঃ ৫:১৪)

গ. এলকোহল বিবেককে বাধাগ্রস্ত করে

মানুষের মগজে একটি বিবেচনা কেন্দ্র আছে। এ বিবেচনা কেন্দ্র মানুষকে সেই সব কাজ করতে বাধাগ্রস্ত করে, যেসব কাজ সে মন্দ বলে জ্ঞান করে। যেমন কোনো লোক সাধারণত তার পিতা-মাতা এবং গুরুজনের কথা বলার সময় অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করে। তাকে যদি কখনো প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হয় (পায়খানা পেশাব) তার বিবেচনা কেন্দ্র তাকে বাধা দেবে জনসমক্ষে এ কাজ করতে। এ জন্য সে গোপন জায়গা ব্যবহার করে।

মানুষ যখন মদ পান করে, তখন তার মগজের এই বিবেচনা কেন্দ্র স্থবীর হয়ে পড়ে (অর্থাৎ নিজেই কাজ করতে বাধাগ্রস্ত হয়)। মদ্য পানে মাতাল ব্যক্তিকে যে অস্বাভাবিক আচার আচরণ করতে দেখা যায়। তার সুনির্দিষ্ট কারণ এটাই। যেমন মাতাল লোককে অসম্মানজনক কথা বলতে দেখা যায়, এমনকি সে যদি তার পিতা-মাতার সাথেও কথা বলতে থাকে। কেননা তখন তার এই ভুলকে উপলব্ধি করতেই সক্ষম হয় না। মাতাল হয়ে অনেকেই পেশাব করে দেয় তাদের কাপড়ে। না তখন সে ঠিক মতো কথা বলতে পারে, না পারে সোজা পায়ে হাঁটতে।

ঘ. ব্যভিচার, ধর্ষণ, নিসিদ্ধ আত্মীয়ার সাথে জোরপূর্বক যৌনতা এই সবকিছু মদ্যপায়ীদের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়।

আমেরিকার ন্যাশনাল ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এর ন্যাশনাল ভিকটিমাইজেশান সারভে ব্যুরো অব জাস্টিস-এর পরিসংখ্যানে শুধু মাত্র ১৯৯৬ সালে প্রতিদিন গড়ে ২৭১৩ ধর্ষণের ঘটনা সংগ্রহ করা হয়েছিল, রিপোর্টের মন্তব্য বলা হয়েছে ধর্ষকদের অধিকাংশই ঘটনার সময় মাতাল ছিল, নারী উৎপীড়নের ক্ষেত্রেও এদেরকেই বেশি পাওয়া যায়।

একই পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৮% আমেরিকান- মা-বোন, অথবা কন্যার সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত। অর্থাৎ প্রতি বারো বা তেরে জনের একজন আমেরিকান এই কর্মে অভ্যস্ত এবং দু'জনের একজন অথবা উভয়ে এসময় মাতাল থাকে। এইজস বিস্তারের ক্ষেত্রে মাদকের ভূমিকা কান ও মাথার মতো (অর্থাৎ কান টানলে মাথা আসে) তাই মাদকাসক্তিই মারাত্মক ও প্রাণঘাতী ব্যাধি।

ঙ. প্রতিটি মাদকাসক্তিই লোকই প্রাথমিক পর্যায়ে সৌখীন পানকারী থাকে

অনেকেই মদের পক্ষ অবলম্বন করে বলবেন, ভাই পার্টি-পরিবেশে একটু আধটু হলে ভালোই লাগে। আমাদের দৌড় ঐ পর্যন্তই। এক কি দুপেগ। আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখি, আমরা মাতাল হইনা কখনো ইত্যাদি ইত্যাদি।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলাফল এই যে, প্রত্যেকটি মদ্যপ মাতালই প্রাথমিক পর্যায়ে সৌখীন পানকারী ছিল। এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি যে মদ্যপ বা মাতাল হয়ে যাবার জন্য মদ পান শুরু করেছিল। অপরদিকে কোনো সৌখীন মদ পানকারীই একথা বলতে পারবেনা যে, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন যাবত এভাবেই দু'এক পেগ করেই খেয়ে এসেছি। কোনো দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাইনি। আর মাতাল হলে কেমন লাগে সে স্বাদও পাইনি।

চ. জীবনে একবারও যদি কেউ মাতাল হয়ে লজ্জাকর কোনো কাজ করে থাকে সে স্মৃতি তাকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ভোগাবে।

ধরুন, কোনো সৌখীন সামাজিক মদপানকারী, জীবনে মাত্র একবার নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাতাল হয়েছিল। আর সেই দিনই তার দ্বারা ধর্ষণ বা আপনজন কারো ওপরে যৌন অত্যাচার মূলক কোনো দুর্ঘটনা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যদি সে, সেই কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ক্ষমা পেয়েও গিয়ে থাকে তবু সুস্থ ও স্বাভাবিক একজন মানুষকে সারাজীবন সেই স্মৃতির কুৎসীৎ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে- যে করেছে সে এবং যার ওপর তা সংঘটিত হয়েছে সে -উভয়কেই এই অপূরণীয় ও অপরিবর্তনীয় ক্ষতির ভোগান্তি পোহাতে হবে।

ছ. হাদীসে মদের নিষিদ্ধতা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ-

১. "মদ সকল মন্দ ও অশ্লীলতার মা (উৎস) এবং যাবতীয় মন্দের মধ্যে ওটা সবচাইতে লজ্জাকর।"-সুনানে ইবনে মাজাহ্ অধ্যায় ৩০ । হাদীস নং ৩৩৭১।

২. এমন সকল, যা নেশাগ্রস্ত করে অনেক পরিমাণে তা নিষেধ (হারাম)। এমনকি তা অল্প পরিমাণ গ্রহণ করা হলেও। তাই এক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই। তা এক ঢোক অথবা এক ড্রাম।

৩. "হযরত আয়শা ঈ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মদের সাথে জড়িত এমন দশ শ্রেণীর লোকদের ওপরে আল্লাহর অভিশাপ। (১) যারা তা তৈরী করে (২) যাদের জন্য তা বানানো হয় (৩) যারা তা পান করে। (৪) যারা তা বহন করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায় (৫) যাদের জন্য তা নিয়ে আসা হয় (৬) যারা তা পরিবেশন করে। (৭) যারা তা বিক্রি করে (৮) যারা তা বিক্রি লব্ধ টাকা ব্যবহার করে (৯) যারা তা কেনে এবং (১০) যারা তা কেনে অন্য আর একজনের জন্য।"

ছ. মদ্যপায়ীরা যে সব রোগে আক্রান্ত হয়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সামনে এমন বেশ কিছু রোগের উৎপত্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে যেসব রোগে সাধারণত মদ্যপায়ীরাই আক্রান্ত হয়। মদ এমন একটি কারণ, যে কারণে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু মদ পানের কারণে পৃথিবী থেকে অকালে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। সাধারণত মদ্যপায়ীরাই আক্রান্ত হয় এমন অতি পরিচিত কিছু রোগের একটি ছোট তালিকা দেয়া হলোঃ

১. যকৃৎ বা কলিজা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া। যা লিভার সিরোসিস নামে পরিচিত।
২. অম্লনালীর ক্যান্সার এবং মাথা, গলা, কলিজা ও মল নালীর ক্যান্সার।
৩. অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের প্রদাহ।
৪. হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বা হৃদয় স্পন্দন সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ, হাইপার টেনশান।
৫. হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন নালী সমূহের যাবতীয় রোগ, গলনালী প্রদাহ এবং হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া।
৬. পক্ষাঘাত, সন্যাস রোগ এরকম আরো অন্যান্য প্যারалаইসিস।
৭. স্নায়ু ও মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ।

এরকম আরো অসংখ্য- বাংলা ভাষায় যেসবের নামকরণ বেশ কষ্টসাধ্য একারণে তালিকাও এখানেই ইতি টানা হলো।

জ. মাদকাসক্তিই একটি রোগ

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মদ্যপায়ীদের ব্যাপারে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তারা এটাকে এখন আর নেশা বলেন না, বলেন এটা নিজেই একটা রোগ। ‘ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ একটা পোষ্টার বের করেছে, তাতে বলা হয়েছে যদি ‘মদই’ রোগ হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে এটাই একমাত্র রোগ যা-

- ✓ সুন্দর সুন্দর বোতলে ভরে বিক্রি হয়: পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও টেলিভিশনের মতো প্রচার মাধ্যমে তার বিজ্ঞাপন করা হয়।
- ✓ সরকারের জন্য রাজস্ব আমদানী করে।
- ✓ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্য রাজপথে নিয়ে আসে।
- ✓ পারিবারিক জীবন ধ্বংস ও অপরাধ প্রবণতার আসল হোতা।

মদ শুধু একটি রোগই নয় – শয়তানের কারসাজি এটা

আল্লাহ সুবহানাহ্ তা‘আলা মানুষের জন্য তাঁর সর্বোত্তম অনুগ্রহ আল-কুরআনে শয়তানের পাতা এই লোভনীয় ফাঁদ সম্পর্কে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। তাই কুরআনে বিদ্বৃত জীবন যাপন পদ্ধতিকে ‘দ্বীনুল ফিতরাহ’ বা মানুষের প্রকৃতিসম্মত জীবনব্যবস্থা ‘ইসলাম’ বলা হয়। এর সকল বিধি-নিষেধের আসল উদ্দেশ্য মানব প্রকৃতিকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা। মদ মানুষকে তার প্রকৃতগত স্বভাবের ওপর দাঁড়াতে দেয় না। একথা স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তির বেলায় যেমন সত্য তেমনি বৃহত্তর কোনো সমাজের ক্ষেত্রেও। এটা মানুষকে নিচে নামিয়ে পশুর পর্যায়ে নিয়ে আসে অথচ মানুষ দাবি করে যে, সে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠতম। সর্বোপরি ইসলামে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ “হারাম”।

সূত্রঃ ডঃ জাকির নায়েক এর প্রশ্ন – উত্তর পর্ব সমগ্র

তৃতীয় অধ্যায়

দাওয়াহ দেওয়ার পদ্ধতি

কনভারসেশন ১

বিষয়: আল্লাহ যত নবী পৃথিবীতে প্রেরন করেছেন, তাদের মধ্যে একজনও কেন মহিলা নেই? পুরুষকে কেন নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে?

এলিন: হাই আবদুল্লাহ! কোথায় যাচ্ছিস?

আবদুল্লাহ: আসসালামু আলা মানিতাবাউল হুদা।

মা এর জন্যে নতুন হিজাব নিতে যাচ্ছি।

এলিন: তোদের ধর্মে নারীদের এতো সম্মান, তাহলে তোদের কোনো মহিলা নবী নেই কেনো?

আবদুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ। সাধারণ মানুষের চাইতে নবীগনের বেশি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং তা সমাধান করতে হয়। যা একজন নারীর জন্যে চ্যালেঞ্জিং।

এলিন: কেমন চ্যালেঞ্জিং?

আবদুল্লাহ: নবীকে অনেক মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে যা নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

এলিন: নবী ইমামতি করেছে নারী নবী ইমামতি করলে কি সমস্যা?

আবদুল্লাহ: যেমন - নবীকে নামাযে ইমামতি করতে হবে যদি মহিলা ইমাম হয় আর পুরুষরা পেছনে থাকে তাহলেই আল্লাহর দিকে মনযোগের চাইতে উক্ত মহিলার দিকে মনযোগ বেশি যাবে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান সেটাই প্রমাণ করে।

এলিন: সে মানলাম। কিন্তু তোরা মুসলিমরা কি মেয়েদের এতোই দুর্বল ও অদক্ষ মনে করিস যে তাদের নবীদের মতো তারা অন্যদের দাওয়াহ দিতে পারতো না?

আবদুল্লাহ: পয়গম্বরকে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে হয়। হাত মেলাতে হয় যা শরীয়া অনুযায়ী নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, একজন পুরুষ নবী সহজে করতে পারে।

এছাড়া নারীগনকে বাচ্চা ১০ মাস ১০দিন গর্ভে ধারণ করতে হয়। সংসার ছেলে-মেয়ে দেখাশুনা করতে হয় তার উপর যদি নবীর দায়িত্ব এলে তাহলে তা অবিচার হয়ে যায়।

এলিন: তাহলে কি এটা ন্যায়বিচার করা হলো?

আবদুল্লাহ: আল্লাহ বলেন-“আমি ন্যায়বিচারক ও দয়ালু”

আল্লাহ নারীগনকে পবিত্র কুরআন অনেক সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে বিবি মারিয়ম (আঃ) তিনি সমস্ত পৃথিবীর নারীশ্রেষ্ঠা, হযরত আয়েশা হযরত ফাতেমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহতাআলা দায়িত্বের সমবন্টন করার ক্ষেত্রেই নারীগনকে নবী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠাননি।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। আশা করি আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়েছেন।

এলিন: ঠিক আছে এখন কাজে যাচ্ছি। পরে কথা হবে।

কনভারসেশন ২

বিষয়: যদি আল্লাহর ইচ্ছাই সব হয়ে থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই?

অর্থন: হাই হাসান! শুনলাম তোমার নাকি আরেকটা মেয়ে হয়েছে?

হাসান: সবই আল্লাহর ইচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

অর্থন: এই যে বললে সবই আল্লাহর ইচ্ছে, যদি আল্লাহর ইচ্ছাই সব হয়ে থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই?

হাসান: আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহর ইচ্ছেতেই সব হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন

একমাত্র তারই হুকুম চলে এবং তোমরা সবাই তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে’ (সূরা কাসাস : আয়াত-৭০)

এছাড়াও তিনি বলেন

“তোমরা আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ”। (সূরা দাহার: ৩১)

অর্থন: তাহলে কি নিজের ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই ? যারা চুরি ডাকাতি অন্যায় করে তাহলে তারা কেনো শাস্তি পাবে সেসব তো আল্লাহর ইচ্ছেতেই হচ্ছে।

হাসান: আমৃত্যু স্বাধীন ইচ্ছা,একটা পরীক্ষা-তবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইচ্ছা আছে উদাহরন দ্বারা বলা যায়।

ধরুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে আপনার বাড়ি তথা প্রত্যেক এলাকার বিদ্যুৎ আসে। যদি কেউ নিজের আঙ্গুল কারেন্টের লাইনে রাখে সে ধাক্কা খাবে।

এটা তার দোষ, আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন সে ইচ্ছে করলে বিদ্যুৎ হাত দেবে আর ইচ্ছা না করলে দেবেনা।

কিন্তু তার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দায়ী করা যাবেনা সুতরাং দোষটা পড়ে পুরুপুরি মানুষের- কেন সে বিদ্যুতে হাত দিলো?

আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন কারন প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা এক একটা পরীক্ষা।

অর্থন: হুম বুঝলাম।।

কনভারসেশন ৩

বিষয়: ইসলাম আকার বা মূর্তি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু তারা নিজেরাই কেন প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করে?

রবিন: হ্যালো মুহাম্মাদ! তুই কি হিন্দুদের পূজা দেখতে গিয়েছিলি নাকি?

মুহাম্মাদ: আস্তাগফিরুল্লাহ!! আমি হিন্দুদের পূজো তে যাবো কেনো! মূর্তি পূজা ইসলামে হারাম।

রবিন: হাস্যকর কথা বললি!! ইসলাম আকার বা মূর্তি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু তোরা নিজেরাই কেন প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করিস?

মুহাম্মাদ: আলহামদু লিল্লাহ।

কা'বা মুসলিমদের 'কেবলা'। মুসলিমরা তাদের প্রার্থনায় দিক নির্দেশক হিসেবে গণ্য করে। এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, মুসলিমরা তাদের প্রার্থনায় কা'বার দিকে মুখ করে বটে তবে তারা কাবা ঘরের উপাসনা করে না। উপাসনা করে সেই ঘরের মালিক অদৃশ্য আল্লাহ তা'আলার।

রবিন: এই দিক কি তোরা নিজেরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছিস?

মুহাম্মাদ: জ্যোতীর্ময় কুরআনে বলা হয়েছেঃ-

“তোমার (নির্দেশনার জন্য) বার বার আকাশের দিকে করে তাকানো আমরা দেখেছি। এখন আমরা কি তোমাকে ঘুরিয়ে দেব সেই কেবলার দিকে যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে? তাহলে ঘুরিয়ে নাও তোমরা থাকনা কেন (নামাযে) তার দিকেই মুখ ফিরিয়ে নেবে।”

(2:144)

রবিন: নামাজ পড়িস বুঝলাম কিন্তু কা'বা কে উদ্দেশ্য করে তোরা তাওয়াফ করিস কেনো?

মুহাম্মাদ: কা'বাকে ঘিরে তওয়াফ করা আল্লাহর একত্বের নির্দেশক মুসলিমরা কা'বা যেয়ারতে মক্কায় গেলে 'তাওয়াফ' করে।

অর্থাৎ কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। কাজটি এক আল্লাহ বিশ্বাস ও উপাসনার নিদর্শন। প্রতিটি বৃত্ত গোলাকার এবং তার একটিই কেন্দ্র বিন্দু থাকে। কাজেই উপাসনার যোগ্য আল্লাহ-মাত্র একজনই, এটা তারই অন্যতম নিদর্শন।

রবিন: আর তোরা যে ওই একটা কালো পাথরে চুমু দিস! সেটা কি পাথর পূজো নয়??

মুহাম্মাদ: হযরত উমর রাঃ এর হাদীস হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর সম্পর্কিত হযরত উমর রাঃ এর একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে। হাদীসে শাস্ত্র অনুযায়ী যাকে 'আছার' বা ঐতিহ্য বলা যায়। বুখারী শরীফের হজ্জ সম্পর্কিত ৩৫৬ অধ্যায়ে ৬৭৫ নং হাদীসে, উমর রাঃ বলেছেন-

“আমি জানি তুমি একটি পাথরখন্ড মাত্র এবং না কোনো উপকার করতে সক্ষম না কোনো ক্ষতি। আমি যদি না দেখতাম খোদ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তোমাকে স্পর্শ করেছেন তা হলে কস্মিন কালেও আমি তোমাকে স্পর্শ করতাম না।”

রবিন: তাহলে তুই কি বলতে চাচ্ছিস যে কাবা ঘর কে তোরা পূজো করিস না ?

মুহাম্মাদ: মানুষ কা'বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সময়ে লোকেরা কা'বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিত। মুসলিমরা কা'বা ঘরের উপাসনা করে বলে যে তোর মনে হয়, এখন তুই ই বল কোন মূর্তি-পূজারী, যে মূর্তি সে পূজা করে, তার মাথার ওপরে উঠে দাঁড়ায়? বাকিটা তুই নিজেই বুঝে নে!

রবিন: হুমম বুঝলাম। এখন কাজের চাপ আছে, পরে কথা হবে।

কনভারসেশন ৪

বিষয়: -মুসলিমগণ কুরআনের আয়াত রহিতকরন বিশ্বাস করেন তার মানে- সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছেন ও পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন?

ঋত্বিক: কিরে আহমাদ! কোথায় যাচ্ছিস?

আহমাদ: এইতো কুরআন শিখতে যাচ্ছি শায়খের কাছে।

ঋত্বিক: আচ্ছা তুই কি বিশ্বাস করিস কুরআনের রহিতকরনে?

আহমাদ: আলহামদুলিল্লাহ। আমি বিশ্বাস করি।

ঋত্বিক: তার মানে কি তোদের স্রষ্টা ভুল করেছেন ও পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন?

আহমাদ: আল্লাহ বলেন -

“আমি কোন আয়াত বা প্রকাশ রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।” সূরা বাকারা-২, আয়াত-১০৬

আয়াতের অর্থ নিদর্শন এবং প্রকাশ। এই আয়াত দুভাবে বিশ্লেষণ করা যায়-

১) প্রকাশ রহিত করা মানে পূর্ববর্তী যেসব কিতাব এসেছিল যেমন তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদিও চাইতেও তিনি উত্তম প্রকাশ অবতীর্ণ করি।

২) একে কুরআনের আয়াত হিসাবে নিলে বোঝা যায় কোন আয়াত আল্লাহ রহিত করে এর পরিবর্তে তদপেক্ষা উত্তম আয়াত অবতীর্ণ করেন। দুটোই সঠিক।

ঋত্বিক: তাহলে তো মনে হয় অন্য আয়াতের সাথে এই আয়াতের গড়মিল আছে মনে হচ্ছে।

আহমাদ : দ্বিতীয় বিশ্লেষণকে তোর মতো অনেকে ভুল বোঝে

অনেকে মনে করেন অন্য আয়াতের সাথে এই আয়াতের গরমিল আছে। আল্লাহপাক বলেন কুরআনে -

“তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।” সূরা হুদ আয়াত-১৩

তারা এ দশ আয়াত রচনা করতে অপরাগতা প্রকাশ করলো। তারপর তিনি বলেন যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে তবে একটি-

“মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।”

এরপর তিনি ফাইনাল চ্যালেঞ্জ দেন এরমতো কাছাকাছি (মিমমিছলিহি) একটি সূরা নিয়ে এস-

“এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।”

তারমানে এটার মধ্যে মতদৈততা নেই।

ঋত্বিক: যেমন?

আহমাদ: মতদৈততা হলো দুটো ব্যাপার যেখানে একসাথে ঘটা সম্ভব নয়। যেমন আমি বললাম সে ক্লাস ১০ পাশ করতে পারবেনা এরপর আমি বললাম তুমি এমনকি ৫ম শ্রেণী পাশ করতে পারবেনা এরপর আমি বললাম তোমার ব্রেন এত খারাপ তুমি কেজি পাশ করতে পারবেনা। আমার উপরোক্ত বর্ণনা চারটাই সত্যি ও কোন ভিন্নমত নেই।

ঋত্বিক: তাহলে মদের বিষয়ে যে ভিন্ন ভিন্ন নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেই বিষয়ে তুই কি বলবি?

আহমাদ: মদের ব্যপারেও তিন স্তরে নিষিদ্ধতা এসেছে। একই সাথে নিষেধ হয়নি। যেমন আমি বললাম আমি বরিশালে থাকিনা এরপর বললাম আমি ঢাকায় থাকিনা এরপর বললাম জামালপুর থাকিনা আমার এই তিন বক্তব্য কোন মতদৈততা নেই উপরন্তু তথ্যবহুল।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

ঋত্বিক: এসব উত্তর কই থেকে শিখেছিস? তোদের কাছে যুক্তির কোনো শেষ নেই।

আহমাদ: আল্লাহ সব প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছেন, আমাদের কাছে যুক্তি নয় বরং প্রমাণ রয়েছে- আল কোরআন।

ঋত্বিক: হুমম, ওকে বাই।

কনভারসেশন ৫

বিষয়: যদি আল্লাহ কাফেরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তবে তাদের কেন দোষী সাব্যস্ত করা হয়?

রজ্জিম: হ্যালো উসমান! কেমন আছিস?

উসমান: আল্লাহর রহমতে ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন?

রজ্জিম: ভালো আছি। আল্লাহ একটা প্রশ্নের উত্তর দে ত

যদি আল্লাহ কাফেরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তবে তাদের কেন দোষী সাব্যস্ত করা হয়?

উসমান: আল্লাহ বলেন –

“আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।” সূরা বাকার-২, আয়াত-৭

রজিম: এখানে তাদের দোষ টা কোথায়?

উসমান: আল্লাহ কাফেরদের হটকারিতার জন্য এই উক্তি করেছেন। তাদের কর্মের জন্য এমন দশা হয়েছে। তারমানে এই নয় যে তাদের কর্মফলের জন্য আল্লাহ দোষী।

রজিম: তাহলে কি তারা নিজেরাই অপরাধী?

উসমান: অপরাধী তারা নিজেই উদাহরন স্বরূপ একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ভবিষ্যৎবানী করলেন কিছু ছাত্র ফেল করবে যেহেতু তারা সঠিক মতো লেখাপড়া ও রুটিন অনুসরণ করেনি।

যদি ছাত্রগুলো ফেল করে আপনি কাকে দোষ দেবেন ছাত্রকে নাকি শিক্ষককে? দোষ ছাত্রেরই।

একইভাবে আল্লাহ তাদের অন্তরে সিল মেরে দিয়েছেন কারন তারা ছিল অবাধ্য এই অবাধ্যতার দরুন তারা বিপথে চলে গেছে।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

রজিম: খুব সহজভাবে বুঝিয়ে বললি। থ্যাংক ইউ।

কনভারসেশন ৬

বিষয়: ইসলাম কি বহু খোদায় বিশ্বাস করে কারন অনেক স্থানে আমি-র পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে?

জোহান: হাই জুবায়ের! কেমন আছিস?

জুবায়ের: আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রেখেছেন।

জোহান: কয়জন আল্লাহ মিলে ভালো রেখেছেন তোকে?

জুবায়ের: আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

জোহান: তোরা কি বহু খোদায় বিশ্বাসী?

জুবায়ের: আস্তাগফিরুল্লাহ! আমাদের সৃষ্টিকর্তা কেবল একজন। তার কোনো শরিক নেই।

জোহান: তাহলে কুরআনের বহু স্থানে অনেক স্থানে আমি-র পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে?

জুবায়ের: বহু ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে-

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনে আমরা শব্দটি ব্যবহার করেছেন তারমানে এই নয় তিনি বহু। ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে একটি হল পরিমান বোঝাতে আরেকটি হল সম্মানার্থে।

ইংরেজিতে ইংল্যান্ডের রানীকে আমরা বলে সম্মানার্থে সম্বোধন করা হয়। যা রাজকীয় মর্যাদা। ইন্ডিয়াতেও রাজিব গান্ধি বলেন-‘হাম দেখনা চাতেহে’ এখানে হাম মানে আমরা এটি সম্মানার্থে ব্যবহার হয়েছে। একইভাবে আরবীতে ‘নাহনু’ শব্দটি মর্যাদা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী-

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :-

“কুল হুয়াল্লাহু আহাদ” অর্থাৎ তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সূরা ইখলাস-১১২, আয়াত-১

জোহান: ওহ আচ্ছা। এটা তো এতদিন জানতাম ই না।

ইসলাম ধর্ম নিয়ে আরো জানার চেষ্টা করবো।

জুবায়ের: যেকোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে জানাবেন ইন শা আল্লাহ্।

কনভারসেশন ৭

বিষয়: আল্লাহকে প্রশংসা করা কি প্রয়োজন? না করলে তিনি কেন আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তবে তিনি কি করে রহিম হলেন?

ফ্রেডি: হ্যালো হামজা! কেমন আছিস?

হামজা: আলহামদুলিল্লাহ ভালো।

ফ্রেডি: আলহামদুলিল্লাহ অর্থ কি?

হামজা: সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি তো রহমানুর রহিম।

ফ্রেডি: আল্লাহকে প্রশংসা করা কি প্রয়োজন? না করলে তিনি কেন আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তবে তিনি কি করে রহিম হলেন?

হামজা: আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ অল-রেডিই মহান-

ধরুন কেউ বললো আল্লাহ্ আকবার বা আল্লাহ মহান তার মানে এই নয় আল্লাহ তার প্রশংসার কারনে আরো মহান হয়ে গেলেন আল্লাহ অলরেডিই মহান যতই তাকে

প্রশংসা করা হোক বা না হোক তিনি মহামহিম আছেন ছিলেন ও থাকবেন। আপনি তাঁর সমুদয় লাভের জন্য প্রশংসা করছেন না। আল্লাহ বলেন –

“হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্ গলগ্রহ। আর আল্লাহ্; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।” সূরা ফাতির-৩৫, আয়াত-১৫

ফ্রেডি: তবে তার প্রশংসা করা উচিত কেনো?

হামজা: তাঁর প্রশংসা করা প্রয়োজন আমাদের লাভের জন্য-

আল্লাহ সমস্ত চাওয়া-পাওয়া থেকে মুক্ত। তাঁর প্রশংসা করা প্রয়োজন আমাদের লাভের জন্য। আপনি এমন কারো সম্মান করবেন যে সর্বজ্ঞ, অত্যন্ত সুক্ষদর্শী ও সব কিছু যার আয়ত্বাধীন, তাঁর প্রশংসা করে আপনি নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন। এজন্যই প্রত্যেক মুসলিম প্রতি নামাযের শুরুই করে তাকে মর্যাদাসূচক উক্তি করে।

ফ্রেডি: কতক্ষণ প্রশংসা করতে হবে?

হামজা: আপনি আল্লাহর প্রশংসা যতই করেন তা শেষ হবার নয়-

মুসলিমগন তার প্রশংসা করে নিজেকে পরিতুষ্ট করেন যে তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও পরিত্রানকারী। ধরুন আপনি হার্টের রোগি, আপনার অসুস্থতার উপশমের জন্য আপনি কি রাস্তার যে কারো থেকে উপদেশ নিবেন নাকি যে হার্টের উপর খুব বিখ্যাত স্পেশালিষ্ট তার কাছ থেকে নিবেন আপাত দৃষ্টিতে তার কাছ থেকেই উপদেশ নিবেন যিনি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

অতএব আল্লাহর প্রশংসা আমাদের নিজেদের উপকার ও স্বার্থের জন্য। আপনি যতই আল্লাহর প্রশংসা করেন তা শেষ হবার নয় কারন আল্লাহ বলেন-

“হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না। ” সূরা কাহাফ-১৮, আয়াত-১০৯

আরও বলা হয়েছে –

“পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়) , তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তবুও আল্লাহর কথা (লেখা) শেষ হবে না। অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। সূরা লুকমান-৩১, আয়াত-২৭

আল্লাহ আপনার ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। আপনি যতই প্রশংসা করেন তা শেষ হবে না। এবং তা করবেন আপনার জন্য।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

ফ্রেডি: এমন যদি স্রষ্টা হোন, তবে সত্যিই তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রশংসার হকদার।

কনভারসেশন ৮

বিষয়: বিজ্ঞান আমাদের বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলিমদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?

অব্র: হাই মাহাদী! কেমন আছিস?

মাহাদী: এইতো ভাই একটু কলেজের দিকে যাচ্ছি। আজ আমাদের পিকনিক আছে।

অব্র: তাই নাকি! তা কি কি আইটেম আছে?

মাহাদী: মুরগির রোস্ট, গরুর গোশত, খাসি সব।

অব্র: একটা কথা বলো তো, বিজ্ঞান আমাদের বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলিমদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?

মাহাদী:আলহামদু লিল্লাহ।

ক. পশুর মধ্যে শুধু ত্বনভোজী পশু খাওয়া অনুমোদিত

এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, ব্যক্তি যা আহাৰ করে তার প্রতিক্রিয়া তার আচরণে প্রকাশ পায়। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদি হিংস্র মাংসাশী প্রাণী খাওয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে- এটা তার অন্যতম একটি কারণ। এ ধরনের হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। সে কারণে ইসলাম শুধু মাত্র গরু, মহিশ, ছাগল, ভেড়ার মতো শান্ত ও খুব সহজে পোষ্যমান প্রাণীর মাংস খেতে অনুমতি দেয়। বস্তুত এ কারণেই মুসলিমরা শান্তিকামী-শান্তিপ্রিয়।

অত্র: এই বিষয়ে তোমাদের কুরআনে কি কিছু বলা হয়েছে?

মাহাদী: জ্বি ভাই।

জ্যোতির্ময় কুরআন বলছে- যা কিছু মন্দ রাসূল তা নিষিদ্ধ করেছেন-

”রাসূল তাদেরকে ভালো কাজ করতে আদেশ করেন। আর নিষেধ করেন যাবতীয় মন্দ থেকে এবং তিনি তাদের জন্য হালাল করেছেন যা কিছু ভাল, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন। আর হারাম করেছেন যা কিছু মন্দ অপরিচ্ছন্ন অপবিত্র। ” (সুরা আরাফ-৭: ১৫৭)

”রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যে সব থেকে নিষেধ করেন সে সব থেকে বিরত থাকো। ” (সুরা হাশর-৫৯ : ৭)

একজন মুসলিমের জন্য তাদের রাসূলের এই বার্তার যথেষ্ট যে, আল্লাহ চান না মানুষ এমন কোনো ধরনের মাংস খায়- যেখানে অন্য কিছু ধরনকে (শান্ত-শিষ্ট পশুকে আহাৰের) অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

অত্র: কি কি প্রাণী তবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কেনো?

মাহাদী: মাংসাশী প্রাণী খাবার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ)-এর বাণী সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বেশ কিছু সর্বসম্মত শুদ্ধ হাদীসের মধ্যে ইবনে আব্বাস রাঃ

বর্ণিত মুলিম শরীফের ‘শিকার ও জবাই’ অধ্যায়ের ৪৭৫ নং হাদীসে, সুনানে ইবনে মাজাহর ১৩ অধ্যায়ের ৩২৩২ থেকে ৩২৩৪ হাদীস সমূহ উল্লেখযোগ্য। রাসূল (صلی الله و سلم) খেতে নিষেধ করেছেনঃ

১. তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতওয়ালা হিংস্র জন্তু। অর্থাৎ মাংসাশী বন্য পশু প্রধানত বেড়াল ও কুকুর জাতীয় বাঘ, সিংহ, বেড়াল এবং শেয়াল, কুকুর, নেকড়ে, হায়না ইত্যাদি।

২. তীক্ষ্ণ দন্ডের অন্যান্য প্রাণী যেমন ইঁদুর, ন্যাংটি ইঁদুর, ছুঁচো ও ধারালো নখওয়ালা খরগোশ ইত্যাদি।

৩. সরিশ্রীপ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী যেমন সাপ কুমীর ইত্যাদি।

৪. ধারালো ঠোঁট ও নখওয়ালা শিকারী পাখি যেমন চিল, শুকুন, কাক, পেচাঁ ইত্যাদি।
সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে পারে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক দলিল নেই যে, আমিষ খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ উগ্র ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

অত্র: আচ্ছা বুঝলাম। আজ উঠি তবে।

কনভারসেশন ৯

বিষয়-আল-কুরআন সংকলন করা হয়েছে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে তাহলে তা কিভাবে আল্লাহর আয়াত বলা যায়?

রিশি: হাই জাবির! কেমন আছিস?

জাবির: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

রিশি: জাবির তোমার থেকে একটা বিষয় জানার ছিলো।

জাবির : জি বলুন।

রিশি: আল-কুরআন সংকলন করা হয়েছে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে তাহলে তা কিভাবে আল্লাহর আয়াত বলা যায়?

জাবির:আলহামদুলিল্লাহ্।

আয়াত বা সূরা নাযিলের পরপর সাহাবাদের মুখস্ত করতে ও লিখে রাখতে নির্দেশ দেয়া হত:-

এটা বলা ভুল যে হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআন সংকলন করেছেন প্রকৃতপক্ষে রাসুল (ﷺ)-এর জীবিতকালে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষিত হয়েছিল। যখন কোন আয়াত রাসুল (ﷺ) এর প্রতি নাযিল হতো তিনি অনতিবিলম্বে তা মুখস্ত করে নিতেন এবং সাহাবাদের শোনাতেন এবং তাদের মুখস্ত করতে ও লিখে রাখতে নির্দেশ দিতেন,এবং তিনি সাহাবাদের পড়িয়ে শোনাতে বলতেন শুদ্ধতা যাচাই করতেন অর্থাৎ সাহাবীদের স্মরণ শক্তি পরীক্ষা করে দেখতেন।

তিনি সাহাবাদের সুরার ধারাবাহিকতা বলে রাখতেন ,যেমন-প্রথম যে সূরা নাযিল হয়েছে সূরা ইকরা যা পবিত্র কুরআনে ৯৬নং সূরা যা তিনি জীবরঈল (আঃ) এর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। বর্তমানে যে পর্যায় ক্রমিক সূরায় কুরআন সংকলিত আছে তার অনুরূপ ‘লাওহে মাহফুজে’ লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রতি রমজানে রাসুল(ﷺ) জীবরঈল (আঃ) দ্বারা পুনরাবৃত্তি করতেন। তাঁর মৃত্যুকালীন বছরে রমজানের সময় তিনি দুবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন।

রিশি: তাহলে কুরআন একত্রীকরণ করা হয়েছিল কিভাবে?

জাবির: কুরআন সংরক্ষিত হয়েছিল বিভিন্ন আঙ্গিকে-গাছের বাকলে,চমড়ায় ,উটের সেডলে ,সমতল পাথরে,গাছের পাতায়। ১ম খলীফা আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফত কালে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু কুরআনে হাফেজ শহীদ হন। হযরত আবু বকর (রাঃ)ও ওমর (রাঃ) সাহা

বীগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যয়িদ-বিন-সাবিদ(রাঃ)-কে কুরআন সংকলনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন। সব সাহাবীদের একসাথে করে যয়িদ-বিন-সাবিদ (রাঃ) সব কুরআনের আয়াতকে একসাথে করেন। এরপর তা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর তত্তাবধানে আসলে তাঁর হাত হতে হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট পৌঁছায়।

হযরত ওসমান (রাঃ) খিলাফতকাল-

তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর সময় ইসলাম যখন প্রসার লাভ করছিল। বিভিন্ন স্থানের মধ্যে উচ্চারণগত সমস্যা দেখা দেয়ায় তিনি বিভিন্ন দেশের কুরআন হাফেজ এবং সংকলকদেরকে ডেকে পাঠান

ও হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট হতে সংরক্ষিত কুরআন লিখে রাখতে বলেন ও তা সম্প্রচার করতে বলেন আর বাকী কুরআন তিনি পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন, কারন সব সাহাবীদের পক্ষে সমস্ত কুরআনের আয়াত সংরক্ষিত ছিলনা কারো কাছে ছিল ৫০০ আয়াত বা তার কম বা বেশি। পূর্বের কুরআনে হুবহু তুর্কির ফাত্তাকি যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন সূরা হিজর-১৫, আয়াত-৯-

“আমরা কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষনকারী।”

রিশি: ধন্যবাদ। আমি তাহলে এতদিন ভুল জানতাম।

কনভারসেশন ১০

বিষয়: ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় কেন? অথবা ইসলামে বহু-বিবাহ অনুমোদিত কেন?

উদয়: হ্যালো আবিদ! কোথায় যাচ্ছিস এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে?

আবিদ: দ্বিতীয় বিবাহের জন্যে কনে দেখতে যাচ্ছি।

উদয়: তুই তো অলরেডি বিবাহিত। ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় কেন?

আবিদ: বহু-বিবাহের সংজ্ঞা ‘বহু-বিবাহ’ মানে এমন একটি বিবাহ পদ্ধতি যেখানে এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে। বহু-বিবাহ দুই ধরনের- একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করে। আর একটি ‘বহু স্বামীবরণ’।

অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোক একাধিক পুরুষ বিবাহ করে। ইসলামে পুরুষের জন্য সীমিত সংখ্যক ‘বহু-বিবাহ’ অনুমোদিত। অপর দিকে নারীর জন্য একাধিক পুরুষ বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ‘হারাম’।

উদয়: আমার মূল প্রশ্ন ইসলামে কেনো একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করার অনুমতি পায়?

আবিদ: পৃথিবীতে কুরআনই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ, যে বলে “বিবাহ করো মাত্র একজনকে” ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে কুরআনই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ যা এই বাক্যাংশ ধারণ করে আছে-“বিবাহ করো মাত্র একজনকে” আর কোনো ধর্ম-গ্রন্থ নেই, যা পুরুষকে নির্দেশ একজন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে।

অন্য কোনো ধর্ম-গ্রন্থ -হোক তা বেদ, রামায়ন, মহাভারত, গীতা, অন্যদিকে তালমুদ অথবা বাইবেল। এ সবার মধ্যে স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধ বের করতে পারবে কি কেউ? বরং এসব ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একজন পুরুষ বিবাহ করতে পারে যতজন তার ইচ্ছা।

উদয়: অন্য ধর্মেও একাধিক স্ত্রী রাখতে বলা হয়েছে?

আবিদ: এটা অনেক পরের কথা যে, হিন্দু ধর্ম গুরু এবং খ্রীস্টান চার্চ স্ত্রীর সংখ্যা ‘এক’ এ নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে।

বাইবেল যেহেতু স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধই নেই। সেহেতু আগের কালের খ্রীস্টান পুরুষরা যে-ক’জন খুশি স্ত্রী রাখতে পারত। অসংখ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তাদের

ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী রেখেছে। যেমন রামের পিতা রাজা দশরথ। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের তো অনেক স্ত্রী ছিল!

বাইবেল যেহেতু স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধই নেই। সেহেতু আগের কালের খ্রীস্টান পুরুষরা যে-ক'জন খুশি স্ত্রী রাখতে পারত। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে তাহাদের চার্চ স্ত্রীর সংখ্যা 'এক' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ইহুদীবাদে বহু বিবাহ অনুমোদিত। তাদের তালমুদীয় বিধান অনুযায়ী আব্রাহামের [ইব্রাহীম (আ)] তিনজন স্ত্রী ছিল এবং সলোমনের [সুলাইমান (আ)]-এর ছিল শতাধিক স্ত্রী।

বহু-বিবাহের এই প্রথা চলে আসছিল তাদের “রাব্বাঈ” জারসম বিন ইয়াহুদাহ্ পর্যন্ত। (৯৬০ সি.ই থেকে ১০৩০ সি.ই) তিনিই এর বিরুদ্ধে একটি অনুশাসন জারি করেন। ইহুদীদের ‘সেফারডিক’ সমাজ যারা প্রধানত মুসলিমদের দেশগুলোতে বসবাস করে তারা এই প্রথাকে নিকট অতীতের ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ধরে রাখে। অতঃপর ইসরাঈলের প্রধান রাব্বাঈ একাধিক স্ত্রী রাখার ওপর বিধিনিষেধ জারি করে দেয়।

উদয়: হিন্দুদের জন্য কি বহুবিবাহের অনুমতি নেই?

আবিদ: একটি লক্ষণীয় বিষয়ঃ ১৯৭৫ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী ভারতীয় হিন্দুরা বহু বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিমদের চাইতে অগ্রগামী।

কমিটি অফ দি স্ট্যাটাস অফ ওমেন ইন ইসলাম (ইসলামে নারীর মর্যাদা কমিটি) নামে এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে। বইয়ের ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ-সংক্রান্ত বিবাহ, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা পাঁচ দশমিক শূন্য ছয় (৫.০৬%) আর মুসলিমদের মধ্যে চার দশমিক তিন এক (৪.৩১%)।

ভারতীয় আইন অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত। ভারতে যেকোনো অমুসলিমের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ। এটা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুরাই একাধিক স্ত্রী বেশি রাখছে।

এর আগে তো কোনো বিধিনিষেধই ছিলনা। এমনকি হিন্দু পুরুষদের ক্ষেত্রেও একাধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদিত ছিল। এই তো সেদিন ১৯৫৮ সালে হিন্দু বিবাহ-বিধি অনুমোদিত হলো এভাবে যে, একজন হিন্দুর জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ।

বর্তমানে এটা একটা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আইন। যা নিয়ন্ত্রিত করেছে একজন হিন্দু পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখতে- “হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ” নয়।

উদয়: তবে ইসলাম কেনো অনুমতি দিলো?

আবিদ: সেই কথা ই বলছিলাম।

কুরআন একাধিক বিবাহের নিয়ন্ত্রিত রূপকে অনুমতি দেয় আমি আগে যেমন বলে এসেছি ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে কুরআনই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যা বলে ‘বিবাহ করো মাত্র একজনকে’। কথাটি জ্যোতির্ময় কুরআনের সূরা নিসার নিম্নদ্রুত আয়াতের অংশ-

”বিবাহ করো তোমাদের পছন্দের নারী- দু’জন অথবা তিনজন অথবা চারজন কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তোমরা (তাদের সাথে) ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে না-ও পারতে পারো- তাহলে মাত্র একজন। ” (৪:৩)

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বহু-বিবাহের কোনো মাত্রা নির্ধারিত ছিল না এবং ক্ষমতাবান প্রায় প্রতিটি মানুষ এতে অভ্যস্ত ছিল। কেউ কেউ তো শ’ এর মাত্রা ছাড়ালে ক্ষান্ত হতো না।

কুরআন সর্বোচ্চ চার জনের একটা মাত্রা নির্ধারণ করে দিল। ইসলাম একজন পুরুষকে দুজন, তিনজন অথবা চারজনের যে অনুমতি দিয়েছে তা কঠিন শর্তের মধ্যে আবদ্ধ যে, কেবলমাত্র তখনই তা সম্ভব যখন তাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচারমূলক আচরণ করতে পারবে।

একই সূরার ১২৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

“তুমি কখনিকালেও পেরে উঠবে না স্ত্রীদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে। ” (৪:১২৯)

কাজেই ইসলামে বহু-বিবাহ কোনো বিধান নয় বরং ব্যতিক্রম। বহু মানুষ এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত যে, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা বাধ্যতামূলক। করা এবং না করার ক্ষেত্রে ইসলামের পাঁচটি শ্রেণী-বিন্যাস করা আছে।

১. ফরজ-অবশ্য করণীয় বা বাধ্যতামূলক। ২. মুস্তাহাব-অনুমোদিত অথবা উৎসাহিত। ৩. মুবাহ-অনুমোদন যোগ্য বা গ্রহণ যোগ্য। ৪. মাকরুহ- অনুমোদিত নয় বা নিরুৎসাহিত। ৫. হারাম- বে-আইনী বা নিষিদ্ধ।

এর মধ্যে বহু-বিবাহ মধ্যম শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ অনুমোদন যোগ্য এবং কোনো ভাবে এমন কথা বলা যাবে না যে, একজন মুসলিম, যার দুজন, তিনজন অথবা চারজন স্ত্রী আছে, সে তার তুলনায় ভালো মুসলিম যার স্ত্রী মাত্র একজন।

ঘ. গড় আয়ুষ্কাল পুরুষের তুলনায় নারীর বেশি প্রাকৃতিকভাবে নারী ও পুরুষের জন্মহার প্রায় সমান। একটি নারী শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরুষ শিশুর চাইতে বেশী।

একটি নারী শিশু রোগ-জীবানু ও রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে পুরুষ শিশুর চাইতে লড়াই করতে পারে। এ কারণে শিশুকালে নারীর তুলনায় পুরুষের মৃত্যু হার বেশি।

যে কোনো যুদ্ধের সময় নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়। সাধারণ দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যাধিতে নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়।

গড় আয়ুষ্কাল পুরুষের চাইতে নারীর বেশি। মহাকালে যে কোনো যুগে খুঁজে দেখলে দেখা যাবে-বিপত্তীকের চাইতে বিধবার পরিমাণ অনেক বেশি।

ঙ. ভারতে পুরুষের জন্ম-সংখ্যা নারীর তুলনায় বেশি। এর কারণ নারী শিশুর ভ্রূণ-হত্যা ও নারী শিশু হত্যা। প্রতিবেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে ভারতীয় পুরুষ-জনসংখ্যা নারী-জন সংখ্যার চাইতে বেশি।

এর নেপথ্য কারণ, নারী শিশু হত্যার উচ্চ হার। প্রতি বছর নুন্যতম দশলাখ ‘নারী-জ্ঞানের’ গর্ভপাত ঘটানো হয় এই দেশে যখনই মায়ের গর্ভে তাকে নারী হিসাবে সনাক্ত

করা যায়। যদি এই অভিশপ্ত চর্চা বন্ধ করা যায় তাহলে ভারতেও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে।

চ. বিশ্বব্যাপী নারী জনসংখ্যা পুরুষের চাইতে অধিক আমেরিকায় পুরুষের চাইতে সত্তর লক্ষ আশি হাজার নারী বেশি।

✓ শুধু নিউইয়র্কে পুরুষের চেয়ে দশলাখ নারী।

✓ উপরন্তু নিউইয়র্কের এক তৃতীয়াংশ পুরুষ সমকামী। অর্থাৎ এই লোকেরা কোনো নারী-সঙ্গ বা বিবাহ করতে আদৌ আগ্রহী নয়।

✓ ইংল্যান্ডে পুরুষ জনসংখ্যার সমসংখ্যক নারী বাদ দিলে চল্লিশ লক্ষ অতিরিক্ত নারী।

✓ একই ভাবে জার্মানিতে পঞ্চাশ লাখ অতিরিক্ত নারী।

✓ রাশিয়ায় নব্বুই লাখ।

এরপর শুধু আল্লাহই বলতে পারেন গোটা পৃথিবীতে একজন পুরুষের বিপরীতে একজন নারী ধরে নিলে তারপর কত নারী অতিরিক্ত থেকে যাবে।

ছ. প্রতিটি পুরুষের জন্য মাত্র একজন স্ত্রী এই নিয়ন্ত্রণ বাস্তবতা বিবর্জিত আমেরিকার প্রতিটি পুরুষ যদি একজন করে নারীকে বিবাহ করে তারপরেও তিন কোটির বেশি নারী থেকে যাবে এমন, যারা তার জন্য কোনো স্বামী পাবে না।

উপরন্তু মনে রাখতে হবে, সারা আমেরিকায় সমকামী পুরুষের সংখ্যা দুই কোটি পঞ্চাশ লাখের বেশী। এভাবে চল্লিশ লাখের বেশি নারী ইংল্যান্ডে। পঞ্চাশ লাখের বেশি জার্মানিতে এবং প্রায় এক কোটি নারী রাশিয়ায়- যারা কোনো স্বামী পাবে না।

উদয়: তুমি কি বলতে চাচ্ছিস? ছেলে না পাওয়ার জন্যে তাদের দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে থাকতে হবে??

আবিদ: ধরা যাক, আমার বোন আমেরিকা নিবাসী একজন অবিবাহিতা মহিলা অথবা আপনার বোন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন অবিবাহিতা নারী।

সেখানে তার জন্য দুটি বিকল্প পথ খোলা আছে- হয় সে এমন একজন পুরুষকে বিবাহ করবে যার একজন স্ত্রী আছে অথবা তাকে হতে হবে “জনগণের সম্পত্তি”-অন্য কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে যারা রুচিশীলা তারা প্রথমটাই বেছে নেবে।

অধিকাংশ নারী অন্য নারীর সাথে তার স্বামীকে ভাগাভাগি করতে রাজি হবে না। কিন্তু ইসলামে পরিস্থিতি বিবেচনায় তা-ই অপরিহার্য হয়ে ওঠে-“মুসলিম নারী তার যথার্থ ঈমানের কারণে এই সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে অনেক বড় ক্ষতি ঠেকাতে তার আর এক মুসলিম বোনকে জনগণের সম্পত্তি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন”।

জ. জনগণের সম্পত্তি হওয়ার চাইতে একজন বিবাহিতা পুরুষ বিয়ে করা শ্রেয় পশ্চিমা সমাজের একজন পুরুষের ‘মেয়ে-বন্ধু’ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অথবা একাধিক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক।

এক্ষেত্রে নারীরা যাপন করে মর্যাদাহীন এক অনিশ্চিত-অরক্ষিত জীবন। অথচ সেই একই সমাজ একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে রাজি নয়। যেখানে নারী হতে পারতো একজন সম্মানিতা, মর্যাদাময় অবস্থানের অধিকারিণী এবং যাপন করতো নিরাপত্তাপূর্ণ নিরাপদ জীবন।

যেখানে নারীর সামনে দুটি পথ খোলা। যে স্বাভাবিকভাবে কোনো স্বামী পাবেনা তাকে হয় একজন বিবাহিত পুরুষকেই বিয়ে করতে হবে নতুবা হতে হবে জনগণের সম্পত্তি।

ইসলাম পছন্দ করে নারীকে সম্মানজনক অবস্থান দিতে, প্রথম পথের অনুমোদন দিয়ে এবং ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে দ্বিতীয়টিকে। আরো একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে সব পুরুষের একাধিক স্ত্রী রাখার অর্থনৈতিক বা অনেকের দৈহিক সামর্থ্য থাকেনা।

আরো কিছু রয়েছে যে সবার জন্য ইসলাম নিয়ন্ত্রিত বহু-বিবাহ অনুমোদন করে। কিন্তু প্রধানত নারীর সম্মান-মর্যাদা ও সম্মম সুরক্ষাই লক্ষ্য।

উদয়: বুঝলাম। আজ উঠছি তবে। পরে কথা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আমরা এই নাস্তিকদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করব ?

অতএব কুলাঙ্গার নাস্তিকদের সঙ্গে আমাদের কোনো ধরনের ভালোবাসা ও মিত্রতা রাখা যাবে না। আমরা তখনই পূর্ণ মুমিন হতে পারব যখন আমাদের সম্পর্কের মাপকাঠি হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে সে আমার বন্ধু, যে বাসবে না সে আমার পরম মিত্র হতে পারে না। কারণ, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [২২ : المجادلة]

‘আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী এমন কোনো জাতিকে পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালোবাসে, হোন এই বিরুদ্ধাচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের গোত্রীয় কেউ। এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরা হল আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।’ {সূরা মুজাদালা, আয়াত : ২২}

এদের বন্ধুরূপে গ্রহণের সমালোচনায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِبَيْسٍ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۝ ৮০ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ [৮১ : المائدة] ৮০, ৮১ :

‘তাদের অনেককে তুমি কাফেরদের সঙ্গে মিত্রতা করতে দেখবে, কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম। যে কারণে আল্লাহ তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন, তাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহ, নাবী ও তাঁর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেক ফাসেক।’ {সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ৮০-৮১}

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بِالْحَرْبِ أَذْنَتْهُ فَقَدْ وَلِيًّا لِي عَادَى مَنْ قَالَ اللَّهُ َإِنْ

‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করল আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। [বুখারী : ৬৫০২]

এই নাস্তিকরা এত বড় অপরাধী যে এদের জন্য এমনকি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বা রহমতের দু‘আ করা যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

أُولَى كَانُوا َوَلَوَ الْمُشْرِكِينَ يَسْتَغْفِرُوا أَنْ ءَامَنُوا َوَالَّذِينَ ِلِّلنَّبِيِّ كَانَ مَا)
(١١٣ :التوبة) ١١٣ َالْجَحِيمُ أَصْحَابُ أَنَّهُمْ لَهُمْ نَبِيْن مَا بَعْدُ مِنْ قُرْبَى

‘নবী ও মু‘মিনদের জন্য আত্মীয় স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সংগত নয় যখন তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ১১৩}

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যারা আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচারণ করবে তাদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ তথা ভালোবাসা ও মিত্রতা রাখা যাবে না। এমনকি স্বঘোষিত নাস্তিক হিসেবে মৃত্যু বরণকারীদের জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু‘আ করা যাবে না।

অবশেষে প্রার্থনা, আল্লাহ এই দেশ ও জাতিকে রক্ষা করুন। এ দেশে ইসলাম ও মুসলমানের ইজ্জত-আব্রু হেফাযত করুন। আল্লাহ নাস্তিকদের সুমতি এবং আস্তিকদের

মজবুতি (ঈমানে দৃঢ়তা) দান করুন। ইসলামের স্বপক্ষের লোকদের শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং মিডিয়ার অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

উপসংহার

আমাদের সাহস হারাবার কিছু নেই। ইসলামের শত্রুরা যতই আদাপানি খেয়ে চেষ্টা করুক আমরা ঠিক থাকলে ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তাদের সব কৌশল বিফলে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ ৫৪ : عمران ال } ۵۴ ۝ الْمَكْرِيْنَ خَيْرٌ ۝ وَاللّٰهُ ۝ وَاللّٰهُ ۝ وَمَكْرُۥا ۝

‘আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।’ {সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৪}

ওদেরর ইসলাম নির্মূলের চেষ্টা কোনোদিন সফল হবে না। বরং ইসলাম তার আলোয় উদ্ভাসিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ ৩২ : التوبة } ۳۳ ۝ يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُنۡمِ نُوْرُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ۳۲ ۝ هُوَ الَّذِيۡ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالۡهُدٰى وَدِيۡنِ الْحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلٰى الدِّيۡنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ [۳৩ : التوبة]

‘তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় তাদের মুখের (ফুঁক) দ্বারা, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৩২-৩৩}

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ ৮ : الصف } ۸ ۝ وَلَوْ نُوْرُهُ ۝ مُتِمِّمٌ ۝ وَاللّٰهُ ۝ بِاَفْوَاهِهِمْ ۝ اِلَّا ۝ نُوْرٌ ۝ وَلِيُطْفِئَ ۝ يُرِيدُونَ ۝

‘তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।’ {সূরা আস-সফ, আয়াত : ৮}

আমাদের কাজ হবে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা এবং সম্ভাব্য সব কৌশল প্রয়োগ করা। নিচে উল্লেখিত আল্লাহর বাণী থেকেই আমরা নিজেদের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

هِيَ بِأَلْتِي وَجَدَلَهُمْ طِ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلٌ إِلَىٰ أَدْعِ ﴿
بِالْمُهَنْدِينَ أَعْلَمَ وَهُوَ سَبِيلُهُ عَنِ الضَّلِّ بِمَنْ أَعْلَمَ هُوَ رَبُّكَ ۖ إِنَّ أَحْسَنَ
[النحل: ১২০] ﴿ ১২০

‘তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।’ {সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১২৫}

ইসলামের শত্রুদের নির্মূলে চেষ্টা যদি সর্বোচ্চ হয় তবে আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবেনই। প্রয়োজনে তিনি ফেরেশতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন। নিচের আয়াতগুলোয় লক্ষ্য করুন। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝ ٦٠﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَصَرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٦٢ الانفال :
[٦٠, ٦٢]

‘আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে

‘আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, ‘হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন? তিনি বলবেন, ‘এমনিভাবেই তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল’। আর এভাবেই আমি প্রতিফল দান করি তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে না। আর আখিরাতের আযাব তো অবশ্যই কঠোরতর ও অধিকতর স্থায়ী। এটি কি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন। আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটি কাল নির্ধারিত হয়ে না থাকত, তবে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হত।’

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ <https://www.academia.edu/111568938/>